গল্প

সল্প

অর্চিতারা যখন হারায়

বিভা রায়চৌধুরী, এফ ই ৫০৮/২

এবার 'ও' থানায় ফোন করল।

'ও' মানে অনন্য। অনন্য চৌধুরী। প্রথমে সমস্ত আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি ফোন করেছে। প্রত্যেকেই বলেছে, 'না আসেনি তো। কোথায় গেছে, আমাদের এখানে আসবে বলে এসেছিল?' ও তখনই আমতা আমতা করে বলেছে, 'না মানে, একবার যেন শুনেছিলাম ওদিকে যাবে তাই গেছে কিনা জানতেই ফোনটা করলাম। ঠিক আছে এসে যাবে এক্ষুনি। ওকে বাই-ই' ফোনটা নামিয়ে রেখেছে, আবার বুকে বল নিয়ে আর এক বাড়ীর উদ্দেশ্যে ফোন তুলেছে। রাত দশটার পর থেকেই ওর কেমন ভয় করছিল। একটা অশুভ চিন্তার প্রেত অস্তিত্ব যেন আবছা আঁধারে লুকোচুরি খেলছিল অনন্যর সাথে। সম্ভাব্য সব জায়গায় ফোন করা শেষ হয়ে গেলে হাসপাতাল গুলোর উদ্দেশ্যে রিং করে যেতে লাগলো। প্রত্যেকেরই উত্তর এমন চেহারার কোন অ্যাক্সিডেন্টের খবর তাদের কাছে নেই। তাছাড়া বিকেল থেকে কোন মহিলা অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্টই আসেনি আজ।

আজ অনন্য একটু আগেই ঘরে ফিরেছে। অফিসের কাজে বাইরে বেরিয়ে আর অফিসে ফেরেনি। কিছু ফুল কিনে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। সন্ধ্যায় জমিয়ে চা পর্ব চুকোতে মাংসের কাটলেট আর ফিস ফ্রাই এনেছিল। মনটা খুব খুশি ছিল ওর। আজকের তারিখে ওদের ফুলশয্যা হয়েছিল। এই রাতটাকে কেউ মনে করে না, সবাই বিবাহ বার্ষিকী পালন করে। কিন্তু এই রাতটাই তো সমস্ত অনভিজ্ঞতার অবগুণ্ঠন সরিয়ে নরনারীর হাত ধরে পৌঁছে দেয় এক নতুন প্রান্তে। মা বাবা ভাই বোন শিক্ষা সব কিছু মিলিয়ে জীবনের যে ধারা বয়ে আসে -- সেই ধারায় মিলিত হয় আর একটা উপধারা। এই ধারাই মুখ্য ধারা রূপে জীবনের পাঠ শেখায় এই রাতে। ওর কাছে এই রাতই জীবনের সেতু।

ন'টা বাজার একটু পরেই অনন্য বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ও বাসস্ট্যান্ডে সাধারণত আসে না। আজ এলো। ভালো লাগছিল না তাই। কিন্তু প্রতীক্ষার সীমা অতিক্রম করল। একসময়ে এবার প্রতীক্ষা আর উদ্বেগ একাকার হয়ে গেল। রাতের গভীরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় শেষ বাস খানাও স্টপেজ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। চারিদিক শূন্য। আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো অনন্যর। বাসস্ট্যান্ডে আর দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না। কোন গাড়ি-ঘোড়া এ রাতে এ অঞ্চলে আর আসবে না। এখনো এদিকটা তেমন জনবহুল হয়নি। সব সরকারি কোয়ার্টার্স। এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বদলি হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফিরে আসে। দশটা বাজতেই ঘরে ঘরে নীরবতা নেমে আসে। দৈত্যের মতো বাড়িগুলোর ফোঁকর থেকে দু একটা আলোর রশ্মি দেখে বুঝতে হয়, এরা স্থানীয় কর্মী, তাই এখনও জেগে আছে। নইলে রাতে অন্ধকারে বাড়ি গুলোর দিকে তাকালে ভয় ভয় করে। বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরেই ফোনগুলো সমাধা করে রাস্তার দিকে হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল। একটা একটা সিগারেট বের করে খেলো না, পুরো প্যাকেটটা টেবিলে রেখে দিল। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখলো, আর তার ফেরার আশা নেই, খুঁজতে যাবারও প্রশ্ন ওঠে না। ট্যাক্সি বাস তো মিলবেই না, মিললেও যাবে টা কোথায়। সকালবেলা অফিস যাবার সময়ে অর্চিতা বলেছিল, ''আজ একটা মিটিং আছে। ফিরতে সাড়ে সাতটা, আটটা হবে, বুঝেছ?'' ও শুধু বলেছিল, ''বেশ তো।'' ব্যাস! এই পর্যন্ত। এর বেশি শোনেনি। সভা মিটিং সেমিনার তো লেগেই আছে। রোজই ওকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে নানা কাজে। মহিলা অর্গানাইজেশনের একজন পদস্থ

সদস্যার কাছে একটা কিছু নতুন বা এক আধবারের ব্যাপারও নয়, তাই কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কখন ফিরবে, কিসের মিটিং-এ প্রশ্নগুলো আজকাল আর করে না ও। একজন কর্মব্যস্ত মহিলাকে এ প্রশ্ন করাটা অনেকটা কৈফিয়তের মত শোনায় ওর কাছে। দরজায় শব্দ হতেই পিছন ফিরে তাকালো অনন্য। কাজের ছেলেটা আবার এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়! এই নিয়ে ও তিনবার এলো। মুখে ওই একই প্রশ্ন, 'সাব! মাইজি কো কোই পাতা মিলা?' প্রতিবারই উত্তর দিয়েছে, না রে, এখনও খবর করতে পারিনি। উল্টে প্রশ্ন করেছে, 'আভি কেয়া গায়া সাব্।'

দেখি কি করতে পারি। যা তুই খেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে। এবার এসে ডাকল — 'সাব্'

'উঃ।'

'থানা মে যাইয়ে সাব্'

'হ্যাঁ এবার ভাবছি থানায় খবর দেওয়া ছাড়া কোন পথ নেই।'

'তুই খেয়েছিস?'

'না সাব্।' কান্না জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিল। বারো বছরের এই ছেলেটা বাংলা বিহারের বর্ডার থেকে কুড়িয়ে এনেছিল অর্চিতা। ও মায়ের মত ভালবাসে অর্চিতাকে।

থানার নাম্বারে রিং করতেই ও পাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল হ্যালো, ও . সি. কথা বলছি।

আমি খুব বিপদে পড়েছি। আমার বাড়ি আপনাকে একবার আসতে হবে। বাড়ির ঠিকানা নাম বলল অনন্য। 'কি ব্যাপার চুরি টুরি হয়েছে নাকি?'

'না আমার স্ত্রী তিনটের সময় বেরিয়ে গেছেন এখনো ঘরে ফেরেননি।'

'বয়স কত? ঝগড়াঝাটি হয়েছিল? তাছাড়া কোন লভ অ্যাফেয়ার ছিল কিনা,' প্রশ্নের ধরনে গাটা গুলিয়ে উঠলো অনন্যর।

এতগুলো প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না অনন্য। বললো 'হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি খুঁজতে একটা ছবি দরকার হয় নিশ্চয়। আপনি আসুন আমি ছবি রেডি করছি।' ফোনটা রেখে দিল। অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। নিছুম রাত্রি, ঝাঁ ঝাঁ শূন্যতা তীরের মত বুকের ভিতরে বিঁধতে লাগলো। সকালেও এ ঘর এই সংসার একটা সুন্দর পূর্ণতায় সরগরম ছিল।

এখন গ্রাস করেছে একটা ভয়াবহ রিক্ততায়।

ঘড়ির কাঁটা দিন, মাস, বর্ষ পেরিয়ে শতাব্দীর দীর্ঘতা নিয়ে টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে ঘন্টার কাঁটা স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে। ছুঁতে যেন পারছে, পৌঁছতে পারছে সেকেন্ড আর মিনিটের কাঁটার চলার ছন্দকে পেরিয়ে -- অনন্য চাইছে এই দুরূহ রাতের অন্তিম ঘনিয়ে আসুক। ও ছুটে বেরিয়ে পড়ুক শহরটার বুকে। ঘরে বসে বন্দি পাখির মতো এই জীবন যন্ত্রণার অন্ধকার কতক্ষণে মুক্ত হবে, কতক্ষণে ও সূর্যের মুখ দেখবে।

কিন্তু! এক নিমেষে ওর চিন্তা স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেল। যে প্রভাতের জন্য ও ছটফট করছে, সেই প্রভাতের আলো ওর সামনে এক ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে দিল। লোকলজ্জা ওকে চারিদিক থেকে প্রেতিনীর মত বিকৃত বীভৎস মুখে হাঁ করে গিলতে এলো। সকাল হলেই জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে অর্চিতার অনুপস্থিতি। রাতের আঁধারে যা ঢাকা আছে সকাল হলেই তা মেলে যাবে শত শত কৌতুহলী প্রশ্নের মুখে। বাড়ীর গৃহিনী কই, দেখছি না তো, এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তথ্য নিতে আসবে জনে জনে। মিসেস কই, অর্চিতা কই, কাকিমা কই, বৌদি কই। এই সহস্র কই কে কি দিয়ে সামাল দেবে অনন্য! অনন্য রাতে না ফিরলে বা দেরী হলে এরা আশেপাশের, আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসতো ওর কোন বিপদ হলো কিনা জানতে! জীবনটার আশঙ্কায় শঙ্কিত প্রতীক্ষায় তারা অর্চিতাকে সঙ্গ দিত। কিন্তু অর্চিতার এই অনুপস্থিতিতে তাদের মনে কণামাত্র মৃত্যু আশঙ্কা আসবে না, ওর মৃত্যু ভয়ে কেউ ভীত হবে না। সমবেদনা জানাবে না। ভাববে মেয়েটার ইজ্জত আছে তো? ওর সতীত্ব হারিয়ে ফেলল না তো? ও ফিরে এলে সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর সারা দেহ জরিপ করবে। খরদৃষ্টির নিপুণতা দিয়ে যাচাই করতে চেষ্টা করবে, ওর দেহটা লুট হয়েছে কিনা, ওর পবিত্রতা আছে কিনা, ওকে ঘরে তুলে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব কিনা।

অপবিত্রতা পুরুষদের স্পর্শ করে না। দৈহিক শুচির চুলচেরা বিচার চলে নারী দেহ নিয়ে। পাপ পুণ্যের তালিকা দাখিল হয় নারীর শরীরটাকে উপলক্ষ করে। যে ক্ষুধার্ত পশুরা তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায় তারাই বসে বিচারশালায় ন্যায়দন্ড

হাতে নিয়ে — জাত ভাইয়ের জাতের মূল্য বজায় রেখে শাস্তি পরোয়ানা ছুড়ে দেয় স্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে। নারীর মূল্য তার দেহে, তার দৈহিক শুচিতায়।
অনন্য ভাবলো অর্চিতা কি কারো দ্বারা আক্রান্ত হল? কেউ বা কারা? একজন? দুজন...

একদল কুকুর রাস্তায় জড়াজড়ি করে চিৎকার করছে। পরস্পর কামড়াকামড়ি করছে। বেশ খানিকক্ষণ। বোধহয় একটা কিছু সবাই মিলে দাবী করছে। রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠল। একটা ক্ষুদ্র আলো এগিয়ে আসছে। বোঝা গেল ওটা গাড়ীর আলো। গাড়ী খানা এগিয়ে আসছে। জীপ। পুলিশের জীপ এবারে বোঝা যাচ্ছে। একটু বাদেই গেটের কাছে এসে গর্জন করে থেমে গেল। গর্জনটা স্তব্ধ পাড়াটার নীরবতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। যান্ত্রিক শব্দের উপস্থিতিতে সচেতন হয়ে উঠলো অনন্য। সতর্ক দৃষ্টিটা চারিদিক ঘুরিয়ে নিয়ে এলো, গাড়ীর শব্দে কারো ঘরের আলো জ্বলে উঠলো কিনা, জানালায় কোনও কৌতূহলী দৃষ্টি ঘুম জড়ানো চোখে উঁকি দিচ্ছে কিনা। কেউবা অন্ধকারে লক্ষ্য করতে পারে গাড়ীটাকে। কি হচ্ছে ও বাড়ীতে এত রাতে, ওদের বাড়ীতে পুলিশিই বা এল কেন। ওর পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ কাঠ লাগছে। অর্চিতা যদি নিজেকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারে তবে কি সে ফিরে এলে তার আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সবাই তাকে আগের সম্মান ভালোবাসা শ্রদ্ধা দিতে পারবে, তারা কি মনে রাখবে অর্চিতা ইংলিশে এমএ এবং একজন এডভোকেট, মহিলা অর্গানাইজেশনের নেত্রী হয়ে মঞ্চে বক্তৃতা করে বেড়ায় নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতার দাবি নিয়ে, যে কয়েকবার ছুটেছে ভারতবর্ষের বাইরে!
সদরের কলিংবেলটা জোরে বেজে উঠলো।
ফটো খানা হাতে নিয়ে এলো অনন্য।
দরজাটা খুলে দিয়ে নমস্কার জানালো, প্রতি নমস্কার করে ডান হাতের রুল দিয়ে বাঁ হাতে তালুতে বাড়ি দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন অফিসারটি। 'আপনি অনন্য চৌধুরী?'
'হ্যাঁ ভিতরে আসুন।'
ওই একইভাবে হাতের উপর রুলখানা ঠুকতে ঠুকতে ঘরে ঢুকলেন পুলিশ অফিসারটি। চোখ দুটো দ্রুত তালে ঘুরছে ঘরের চতুর্দিকে। অনন্যর শরীরে, মুখে। একটা সোফা বেছে নিয়ে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ী আপনার?'
'হ্যাঁ, মানে বাবার।'
'কে কে থাকেন বাড়িতে?'
'আমরা স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা এবং আমার ছেলে। দু বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ভাই থাকে রাশিয়া।'
'আর কাউকে দেখছি না কেন?'
'বাবা মা আমার ছেলেকে নিয়ে গত সপ্তাহে সিমলা গেছেন আমার ছোট বোনের বাড়ি।'
'তাহলে বর্তমানে অর্থাৎ আজ আপনি একা?'
'না, ছোট একটা কাজের ছেলে আছে।'
'আপনার স্ত্রী কোথায় এবং কখন বেরিয়েছেন?'
'উনি একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে গেছেন। কোথায় মিটিংটা হচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করিনি। উনি একজন সমাজসেবী তাই বাইরে তো যেতেই হয়।'
'ওঁর বাপের বাড়ি কোথায়? তাঁরা জানেন ওঁকে পাওয়া যাচ্ছে না!'
'না, পাওয়া যাচ্ছে না বলিনি, তবে ওখানে গেছে কিনা জানতে ফোন করেছিলাম। শুনলাম ওখানে যায়নি। এখনও ও ফেরেনি, সেটা জানায়নি।'
'কেন বাবা-মাকে একটা জানানো কর্তব্য নয় কি?'
'কর্তব্য ঠিক, তবে এটা জানানোয় একটু অসুবিধা আছে।'
তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'অসুবিধা? ও, হ্যাঁ ওঁর বাপের বাড়িটা কোথায় বলেন নি কিন্তু।'
'ও, সরি, সুধাময় স্ট্রিটে।'
'ঠিকানাটা বলুন।'
বাড়িতে ঢোকার পর থেকে এবং প্রশ্নের ধরণ দেখে অনন্য অনুমান করেছিল এরা ওকেই সন্দেহ করছে। এই সন্দেহটা অন্যায় হলেও অন্যায় বলা যাচ্ছে না। কারণ আজকাল এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। ক্ষণকাল কি যেন ভাবল অনন্য, তারপর বলল, 'দেখুন আমার স্ত্রী মিসিং এই ভেবেই ইনভেস্টিগেশনটা শুরু করুন। অযথা সময় নষ্ট করে লোক জানাজানি করবেন না।'
'লোক জানাজানি মানে?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অনন্য উত্তর দিল, 'মানেটা খুব পরিষ্কার। এর সাথে আমার স্ত্রীর মর্যাদা জড়িয়ে আছে। যদি সে কোন দুরাত্মার হাতে পরাজিত হয়ে থাকে তবে তা আমি

আমার একার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। তার কারণ শিক্ষাদীক্ষা যোগ্যতায় আমার স্ত্রী সমাজের শীর্ষে বাস করছে, তার সেই স্পর্ধিত মাথা ঘরে পরে রাস্তাঘাটে কোথাও নত হোক, এ আমি সহ্য করতে পারব না। বিনিময়ে ওর মৃত্যু যন্ত্রণাও আমার কাছে কম বেদনার হবে। ও যদি আমার কাছে প্রশ্ন করে আমার জীবনের এই অঘটনটুকু তুমি স্বামী হিসেবে চেপে রেখে বাহ্যিক অপমান থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারনি কি উত্তর দেবো বলতে পারেন?'

'আপনাদের এই গোপনপ্রিয়তাই সমাজের বুকে এই দুর্নীতিটাকে বেশি করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সবাই এগিয়ে এসে এই অন্যায় দমনে আমাদের সাহায্য করুন। সত্যের মুখোমুখি হতে সৎসাহস অর্জন করুন।' পুলিশ অফিসারটি বলল। ওকে থামিয়ে দিয়ে বিদ্রুপের হাসি হেসে অনন্য বলল, 'ব্যাস, ব্যাস। আর বলবেন না। সৎ সাহস দেখিয়ে যতগুলি নিগৃহীতার নিগ্রহ ফলাও করে আইনের দরবারে তোলা হয়েছে তার ক'জনের মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা, ইজ্জত যাই বলুন না কেন, এগুলি আপনারা ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন? পেরেছেন কি সেই লুটেরাদের জন্য এমন দন্ড বের করতে যে দন্ডে এই 'ইজ্জত' শব্দটির দায় আর মেয়েদের একার ঘাড়ে থাকবে না পুরুষ হবে তার সমান অংশীদার। পারবেন লোক জানাজানির পর সেই পাশবিক অত্যাচারের শিকার মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিয়ে দিতে?' অফিসারের মুখে ভাবান্তর ফুটে উঠল। বললেন, 'এই যুক্তি অকাট্য, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজতে হলে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হয়, এটা তো মানবেন।'

'নিশ্চয়ই, তার আগে প্রতিকারের পদ্ধতিগুলো প্রতিকার করে নিতে হবে। আমার আপনার সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়ে শুধু চেষ্টা চালালে তো চলবে না। দু একজনকে শহীদ করা চলে, কিন্তু দলে দলে শহীদ হয়ে বিচারের দ্বারে হেরে ফিরে আসার গ্লানি বইতে যাবে কেন লোকে। বিচারের ভিত গড়ার, তাকে পোক্ত করার দায় আইনের। আমার আপনার ইজ্জত বলি দিয়ে নয়।'

কথা না বাড়িয়ে অনন্য উঠে দাঁড়াল। কাগজ-কলম নিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল। ফটো সহ ঠিকানা হাতে দিয়ে বলল, 'যদি যাচাই করতে চান যেতে পারেন। ঠিকানা, ফটো দুটোই দিলাম।'

নিস্তব্ধ রাতের বুকে শব্দের তুফান তুলে জীপখানা তীব্র আলোর ছটা ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল। আবার নিঃশব্দ। আবার বুকের গহনে নিরবিচ্ছিন্ন ধুকপুকানির অনন্ত স্পন্দন। ড্রয়িং রুমে এসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে থেমে গেল, ওখানে পরপর তিনখানা ছবি ঝুলছে অর্চিতার। একখানা ও রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করছে। অপরখানা প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে, ডাইনে-বাঁয়ে ওদের অর্গানাইজেশনের আরও কয়েকজন সহকর্মী। তৃতীয় খানা তোলা নাইরোবিতে। নারীবর্ষ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ থেকে তিনশোর বেশি মহিলা সদস্য গিয়েছিল ওখানে। সমস্ত মহিলা সমিতিগুলি মিলিয়ে, তাদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে ওদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল সেই বাড়িটার সামনে। স্মৃতির সরু দড়িটা বেয়ে কানে ভেসে এলো অর্চিতার কণ্ঠস্বর। অর্চিতা 'বিশ্বশান্তিতে নারী' এ বিষয়ের উপর ভাষণ দিচ্ছিল মঞ্চে দাঁড়িয়ে। অনন্য সেদিন বসে ছিল অগণিত দর্শকদের সাথে দর্শক গ্যালারিতে। ও বলেছিল আমরা শক্তি বলতে বুঝি অস্ত্র, সৈন্য, পরাক্রম। কিন্তু তা নয়, মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস হচ্ছে শান্তি। কল্যাণকামী ভাবনার আধার গড়ে তোলাই শান্তি। এগিয়ে যাবার অর্থ ঐশ্বর্য নয়। এগিয়ে যাবার অর্থ কর্তব্যবোধ, মূল্যবোধে আগ্রহ এবং মানসিক, মানবিক মূল্যবোধের অনুভূতি। সমস্ত নারী সমিতি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক হয়ে সমস্ত বিশ্বের নারীদের উদ্দেশ্যে ডাক দিতে হবে। পুরুষশক্তিকে নিরস্ত্র করতে হবে, আবেদন করতে হবে গোটা বিশ্বের বিশিষ্ট মহিলাদের কাছে, তাঁরা যেন নিজ নিজ স্বামী-পুত্র-পিতাকে এই ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে গোটা বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতে এগিয়ে আসেন।

এই নিষ্ফল ডাকে কোন ফল হবে না। অর্চিতার জীবনের এই প্রতিভা, জ্ঞান, যোগ্যতার কতটুকু মূল্য দিচ্ছে পুরুষ সমাজ? আজই হয়তো ওকে এক কঠিন নিয়তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। পশুর হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে ওর ভাগ্যের সমস্ত খতিয়ান। এমনি করে মুহূর্তে, নিমেষে হারিয়ে যায় এক একটি মেয়ের সমস্ত গৌরব। এই পরাজয়, এই গ্লানি সর্বাঙ্গে লেপে দেয় পরাভবের নরক যন্ত্রণা, মৃত্যুর পায়ে

মাথা কুটে নিষ্কৃতি খোঁজে নারী আত্মার হাহাকার রাতের পরিক্রমা তিনটের কাঁটা স্পর্শ করল। চিন্তার ঢেউয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ও সোফাটার হাতলে মাথা রাখল। বাকি রাতটুকু ওর আত্মগোপনের শেষ সম্বল। দুর্বল চেতনায় একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল — আবার সেই জীপখানা দরজায় এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে এই অফিসারটি ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, অর্চিতাদেবীকে পাওয়া গেছে। উনি দুর্বৃত্তের হাতে পড়েছিলেন। সবুজ পার্কের পাশেই যে সরকারি কোয়ার্টার উঠেছে, ওখানকার কিছু কর্মী ওদের সাড়া পায়, কারণ বদমাইশগুলো প্রচণ্ড মদ খেয়ে বেসামাল ছিল। আপনারা ওঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু কেউ নড়ছে না। সবাই পাথর হয়ে বসে আছে। চোখের জল একসাথে সবার থেকে মুছে গেছে। অর্চিতার মা, বাবা, দাদা, দিদি অনন্যর মা, বাবা পর্যন্ত স্তব্ধ। অনড়।

হঠাৎ অনন্যর বাবা চিৎকার করে বললেন, তোমরা সবাই চুপ কেন, ওকে ঘরে আনতে হবে না? ওকে নিয়ে এসো! ওঠো। কই ? কেউ উঠছে না। উনি অর্চিতার মায়ের মুখটা দেখলেন, তারপর ওর বাবার কাছে গেলেন। দাদা, দিদি সবাইকে দেখলেন। সবাই মাথা নিচু করে বসে আছেন। এই মুহূর্তে ওকে স্পর্শ করতে ওদের ঘৃণা হচ্ছে। এবার স্ত্রীর কাছে গেলেন। না, কোনও উত্তর নেই। ভাবান্তর নেই। এবার এলেন অনন্যর কাছে। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, অপু। অনন্য আর্তনাদ করে উঠল। বাবা, বাবা! আমি কি করব?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বিকট শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ধড়মরিয়ে জেগে উঠলো অনন্য। একি? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? তাহলে ওটা স্বপ্ন? ওটা স্বপ্ন?? আঃ আঃ আঃ কী আরাম! কিন্তু ফোনটা কেন বাজছে? তবে কি স্বপ্নে যা দেখলাম তা সত্যি? সেই খবরটা দিতেই ফোনটা বাজছে! এতক্ষণে ফোনটার বুকে শব্দের সংকেত পেতে মনটা কি ব্যগ্র ছিল, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে ওই যান্ত্রিক দানবটাকে পিটিয়ে স্তব্ধ করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফোনটা থামছে না। বাড়ছে একনাগাড়ে। বেজেই চলেছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখবে, নাকি ধরবে না। ধরলে যা শুনবে তা কি সহ্য করতে পারবে? মেনে নিতে পারবে? দুহাত মুখে ঢেকে ও চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, অর্চিতা, তুমি মরে যাও। মরে যাও অর্চিতা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি কি করি। কি করি। ত্যাগ? সম্পর্কচ্ছেদ? আত্মহত্যা?

বাঁহাতে রিসিভারটা তুলে নিল।
হ্যালো, 'অনন্য চৌধুরী কে চাই।'
কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, 'কথা বলছি।'
'আপনি খবরটা পাননি। কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় আপনার স্ত্রী অর্চিতা চৌধুরীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ভোলানাথ মিত্র লেনের মুখে। কয়েকজন ভদ্রলোক ধরাধরি করে ওঁকে আমাদের নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। এইমাত্র ওঁর জ্ঞান ফিরেছে। আপনাকে দেখতে চাইছেন। ভয়ের কিছু নেই। আপনি এক্ষুনি আমাদের নার্সিংহোমে চলে আসুন।'

" তোমার মাঝে যে সততা ঘুমিয়ে আছে , তাকে জাগিয়ে তোলবার একটুখানি সুযোগ যদি তুমি দাও , তবে তা শুধু জেগেই উঠবে না, তোমাকেও পরিবর্তিত করে দেবে।"

— ভগবান গৌতম বুদ্ধ

গল্প

সল্প

সিয়া

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, এফ ই ৩৭৭

কাঠফাটা প্রখর রোদে একটা গাছের তলায় সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে স্বপন হাঁফাচ্ছিল। লু বইছে এখন। কলকাতায় এরকম শুষ্ক গরম আগে পড়ত না। এখন গ্রীষ্মে আর্দ্রতা যেন আরও কমে গেছে। আর এই গরমের জন্যই হয়ত কমে গেছে লোকের বাইরে থেকে আনা খাওয়া দাওয়া। লোকের বাইরের থেকে আনা খাবার কমে যাওয়া মানে স্বপনদের মত ডেলিভারি বয়দের কাজ কমে যাওয়া। এমনিতেই এই লাইনে দিনে দিনে ছেলে বেড়ে যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা বাড়ছে আর রেট কমে যাচ্ছে।

স্বপন যে কোম্পানির ডেলিভারি বয়ের কাজ করে তাদের তাদের ডেলিভারির দুটো উপায়, 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি' আর 'গ্রিন ডেলিভারি'। যারা এক্সপ্রেস ডেলিভারি করে তাদের বাইক আছে। সময় কম লাগে, বেশি ডেলিভারিও করা যায়।। গ্রিন ডেলিভারি মানে সাইকেলে ডেলিভার। পেট্রোল পুড়িয়ে দূষণ হয় না। তবে সারাদিনের সাইকেল চালিয়ে ডেলিভারি সংখ্যাটাও কম হয়। ততে পরিবেশের যা উপকার হয় তা হয়, কিন্তু স্বপনের কিছু হয় না। স্বপনও স্বপ্ন দেখে আরেকটু পয়সা জমলে বাকিটা ব্যাংক থেকে ধারদেনা করে ও একটা বাইক কিনে 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি' করে আরও উপার্জন করবে।

গরম লুয়ের হাওয়ার সঙ্গে স্বপনের দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল। ঘণ্টা খানিক অপেক্ষা করছে স্বপন। থেকে থেকে চোখ রাখছে মোবাইলটায় যদি কোন ডেলিভারি করার বরাত আসে। পিঠব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বার করল। প্লাস্টিকের বোতলে জলটা পর্যন্ত তেতে উঠেছে। কয়েক ঢোকের বেশি খাওয়া যাচ্ছে না। খেলেও তৃষ্ণা মিটছে না। দু ঢোক গলায় ঢেলে জলের বোতলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে ঝুমুরকে ফোন করলো স্বপন।

''হ্যালো, কী করছ?''

স্বপনের ফোনটা পেয়ে ঝুমুর খুশি হল। আদুরে গলায় বলল, ''এইতো শুয়ে আছি। জানো ফ্যানের তলায় শুয়ে শুয়ে তোমার কথা খুব মনে হচ্ছে। আমি দিব্যি ফ্যানের তলায় শুয়ে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছি আর তুমি এই গরমে রাস্তায়।''

স্বপন শুকনো হাসল, ''না আমারতো কোন কষ্ট হচ্ছে না,'' তারপর মিথ্যে বলল, ''আজকে গরমটা অনেকটাই কম।''

''তুমি কোথায় এখন?''

''ওইতো সল্টলেকেই। আচ্ছা তুমি আজকে আবার ভারি জিনিস কিছু ওঠাওনি তো?''

ঝুমুর পোয়াতি। এখন ভরামাস চলছে। শরীরে কিছু সমস্যা রয়েছে। ডাক্তার কিছু বিধি-নিষেধ বলেছেন। সেসব নিয়ে ঝুমুরের যত না চিন্তা স্বপনের চিন্তা অনেক বেশি। এই যেমন ভারি তোলা বারণ। তাও ঝুমুর সকালে জলভর্তি বালতি তুলেছিল। ঝুমুর স্বপনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, ''না চিন্তা করো না। আমি সব মেনে চলছি।''

''খেয়েছ?''

''হ্যাঁ খেয়েছি। খেয়েই শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। তুমি খেয়েছ?''

''খেয়ে নেব। আর দুটো ডেলিভারি করেনি।''

''আচ্ছা শোনো, তোমাকে বলেছিলাম টিফিনের কৌটোটা তোমার ডেলিভারি ব্যাগের মধ্যে রাখতে, রেখেছ? ঢাকনিটা ঢক ঢক করছে। এবার পাল্টাতে হবে। টেপ লাগিয়েছ?''

ঝুমুরের ভারি আশ্চর্য মনে হয় স্বপনের ডেলিভারি ব্যাগটাকে। ঠান্ডা জিনিস ঠান্ডা থাকে, গরম জিনিস গরম। সকালবেলাতে বেরোনোর আগে স্বপনের সাদা টিফিন কৌটোটা যত্ন করে গুছিয়ে দেয় ঝুমুর। অবশ্য টিফিন বলতে

অধিকাংশ দিনই রুটি তরকারি। তরকারিটা একেকদিন একেকরকম করার চেষ্টা করে ঝুমুর। আর সেই সঙ্গে একটা আবদার করে টিফিন কৌটোটা যাতে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসানো বড় চৌকো ডেলিভারি বাক্সের ভেতর রাখে। তাতে খাবারটা ভালো থাকবে। স্বপন আবার একটা মিথ্যে কথা বলল, ''হ্যাঁ টেপ লাগিয়ে বাক্সের ভেতর রেখেছি তো।'' তবে এই মিথ্যে কথাটা বলতে স্বপনের খারাপই লাগল। সামান্য একটা জিনিসইতো চেয়েছে ঝুমুর। এই শরীর নিয়ে সকালে যে টিফিনটা তৈরি করে ভালবাসায় মুড়ে টিফিন কৌটোতে ভরে দিয়েছে সেটা ডেলিভারি ব্যাগের মধ্যে রাখতে। মোবাইলটা ছেড়ে পিঠব্যাগ থেকে টিফিন কৌটোটা বার করলো স্বপন। দুপুর গড়াচ্ছে। খিদেও পেয়েছে। এবার খেয়ে নিলেই হয়। কিন্তু খাওয়া আর হলো না। ঠিক সেই সময়েই মোবাইলে ঢুকল পিক আপ মেসেজটা। টিফিন কৌটোর ঢাকনিটা সত্যিই আলগা হয়ে আছে। কোম্পানির দেওয়া টেপ লাগিয়ে ডেলিভারি বাক্সর ভেতর রেখে দিল সাদা টিফিন কৌটোটা।

২

এই দুপুরে কাফেটাতে মৌমিতা আর দেবপ্রতিম ছাড়া আর কোনও খদ্দের নেই। দেওয়াল জোড়া একটা কাঁচের জানলার সামনে কফি টেবিলটার দুপাশে বসেছে দুজনে। টেবিলের ওপর দুটো নীলচে মকটেল। তার ওপর বরফ ভাসছে।

এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভাল। কাঁচের ওপর কফি রঙের ফিল্ম লাগান আছে। তাই বাইরের ঝলসানো রোদ্দুর ভেতর ঢুকছে না। তার ওপর এসির কুলকুলে ঠান্ডা হাওয়া বুঝতেই দিচ্ছে না বাইরে শহরটা এখন ঠিক কত ডিগ্রী টেম্পারেচারে তেতে পুড়ে ফুটছে। ঠান্ডা পানীয়র গ্লাসদুটোর মধ্যেখানে পড়ে রয়েছে ভ্লগ করার ক্যামেরা আর অন্যান্য সরঞ্জাম। দেবপ্রতিম সেগুলো সরিয়ে মৌমিতার হাতের উপর হাত রাখতেই এক ঝটকায় মৌমিতা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, ''ধুস, ভাল লাগছে না।''

''থেকে থেকে একই কথা ঘ্যানঘ্যান করে বলছিস কেন বলতো?''

''বলব না! কিছুতেই একটা ভিডিয়ো বানাতে পারছি না যেটা ভাইরাল হবে অথচ দ্যাখ লোকে কিসব ভিডিয়ো বানিয়ে ভাইরাল করে দিচ্ছে।''

মৌমিতা ইউটিউবে নতুন একটা চ্যানেল খুলেছে। সবে একমাস হয়েছে। গোটা চারেক ভিডিয়ো আপলোড করেছে। কিন্তু না পাচ্ছে ভিডিয়োগুলো ভিউজ, না বাড়ছে লাইক, সাবস্ক্রাইবার। ভিডিয়োগুলো মৌমিতা নিজে তুললেও এডিটিং-এর কাজটা করে দেবপ্রতিম। যে কথাটা মৌমিতাকে অনেকবার বুঝিয়েছে সেটাই আবার বলল, ''তোকে তো বলছি, একটু সময় দিতে হবেতো রে বাবা। এটাতো আর ম্যাজিক নয়। রহু ধৈর্যং।''

মৌমিতা তেতে উঠল, ''ম্যাজিকই। ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ম্যাজিকের মতই। শুধু ঠিকঠাক একটা কনটেন্ট পেতে হবে।''

''কারেক্ট। আমরা সেই ঠিকঠাক কন্টেন্টটাই পাচ্ছিনা। আমরা অন্যদের ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিয়োগুলো ফলো করে কিছু করার চেষ্টা করছি। একটা অন্যরকম গ্রিপিং, এনগেজিং স্টোরি চাই। আপসে ভিডিয়ো ভাইরাল হবে।''

''স্টোরি... স্টোরি...,'' আনমনা হয়ে মৌমিতা বাইরের দিকে তাকাল। তারপর চোখটা চকচক করে উঠল, ''অ্যাই, বাইরে দ্যাখ, দ্যাখ।''

বাইরে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। জনমানুষ প্রায় নেই। শুধু একটা গাছের তলায় সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে লাল টিশার্ট পরা একজন ডেলিভারি বয়।

''কী দেখছিস বলত?'' দেবপ্রতিম জিজ্ঞেস করল।

''স্টোরি। দ্যাখ এই প্রচন্ড গরমে একটা ডেলিভারি বয় অপেক্ষা করছে অর্ডার ডেলিভারি করার জন্য। চিন্তা করে দেখ, এই গরমেও কত মানুষ খোলা আকাশের নিচে তাদের ডিউটি করে যাচ্ছে। ট্রাফিক সিগনালে পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার, ডেলিভারি বয়রা... আচ্ছা আমরা যদি এদের জীবন কাজ নিয়ে একটা সিরিজ করি?''

''হুম করতেই পারিস। কিন্তু ভাইরাল করার জন্য স্টোরির মধ্যে কিছু এক্স ফ্যাক্টার দরকার। তুই যেটা ভাবছিস সেটা ইমোশন। আহারে মার্কা করুণা এক্স ফ্যাক্টর নয়। লোকে পাঁচ সাত সেকেন্ড দেখার পর ভিডিয়োটা আর দেখবে না।''

''কিন্তু... ''
দেবপ্রতিম হঠাৎ মৌমিতাকে থামিয়ে বলে উঠল, ''অ্যাই দাঁড়া, দাঁড়া। লাগতা হ্যায়, স্টোরি মে কুছ টুইস্ট মিলা।''
মৌমিতা দেখল ডেলিভারি বয় ওর ব্যাকপ্যাক থেকে একটা সাদা কন্টেনার বার করে টেপ লাগিয়ে ডেলিভারি ব্যাগটার মধ্যে রাখল।
''কিছু বুছলি?''
মৌমিতা একবার দেবপ্রতিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বাইরে তাকাল।
''ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। একটা ডেলিভারি বয়ের কাজ খাবার পিকাপ করবে, ডেলিভারি করবে। কিন্তু লোকটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কী করল দেখলি? দিজ ইজ দ্য এক্স ফ্যাক্টর। পিকআপ আর ডেলিভারির মধ্যে মাঝেমাঝে কত কি যে ঘটে যায়, এই জায়গাটা ধরতে হবে। চল, হয়তো তোর ভাইরাল স্টোরিটা আজই পেয়ে যাবি।''

দ্রুত কয়েক চুমুকে নীল পানীয়টা শেষ করে দেবপ্রতিম বিল মিটিয়ে মৌমিতাকে নিয়ে কাফের বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখে মুখে যেন আগুনের হল্কা লাগল। মাথায় হেলমেটটা পড়ে নিয়ে বাইকে স্টার্ট দিল দেবপ্রতিম। মৌমিতাকে বলল, ''হাতের ক্যামেরাটা চালু রাখ। ওই ডেলিভারি বয়টাকে দূর থেকে ফলো করব।''

৩

সাইকেল চালাচ্ছে স্বপন। লু'টা আর যেন গায়ে লাগছে না। এক ঘন্টার ওপর অপেক্ষা করার পর ভগবান যেন মুখ তুলে চেয়েছেন। অবশেষে একটা ডেলিভারি পাওয়া গেছে। এই ডেলিভারিটা সময়ে করতে পারলে পাঁচটা গ্রীন ডেলিভারি হয়ে যাবে। ভগবান যদি আজকে আর একটা ডেলিভারি কপালে জুটিয়ে দেন তাহলেই ছ'য়ের টার্গেট পূরণ হওয়ার বোনাস পাবে।

মনে মনে প্রণাম করলেও এই অন্নদাতা ভগবানকে কোনদিন চোখে দেখেনি স্বপন। পরিমলদা এই লাইনে সিনিয়র। দুম করে এটিএমের সিকিউরিটি গার্ডের কাজটা যখন ব্যাংক কোন কারণ ছাড়াই ছাঁটাই করে দিয়েছিল, দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল স্বপন। কোন কাজই জোটাতে পারছিল না। ওদিকে ঝুমুরের পেটে তখন বাচ্চা চলে এসেছিল। সব স্বপ্ন যেন খান খান হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের দূত হয়ে এসে সেই স্বপ্নগুলোই আবার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিল পরিমলদা।

ডেলিভারি বয়ের চাকরি। বাইক থাকলে এক্সপ্রেস ডেলিভারি আর সাইকেল থাকলে গ্রিন ডেলিভারি। পরিমলদার মোবাইল থেকে শুধু আধার কার্ড আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপলোড করতে হয়েছিল। তার সঙ্গে অনলাইনেই সামান্য কিছু ফর্ম ভরা। সেসব পরিমলদাই করে দিয়েছিল। কয়েকদিন পরেই আধার কার্ডে লেখা বাড়ির ঠিকানায় চলে এসেছিল কোম্পানির নাম লেখা লাল টিশার্ট, আইডি কার্ড আর কালো রঙের ডেলিভারি বাক্সটা। ঝুমুর যে কি খুশি হয়েছিল। বলেছিল ওই ডেলিভারি বাক্সটা ভাগ্য ফেরানোর ম্যাজিক বাক্স। সত্যিই তাই। ঈশ্বর তথা নিয়োগকর্তাকে কোনদিন চোখে না দেখলেও স্বপন মনে মনে সবসময় এদের ব্যবস্থাকে কুর্নিশ জানায়।

সব কিছু হয় মোবাইল ফোনে। কাজটাও তেমন ঝঞ্ঝাটের নয়। মোবাইলে দোকানের লোকেশন আসে, ম্যাপ দেখে সেখানে চলে যাও। তারপর খাবারের বাক্স নিয়ে আবার ম্যাপ দেখে ক্লায়েন্টের বাড়িতে পৌঁছে দাও। সময়ের আগে পৌঁছে দিতে পারলে ইন্সেন্টিভ। কোম্পানি আজ পর্যন্ত কখনো কথার খেলাপ করেনি। যে সময় পেমেন্ট দেওয়ার কথা ঠিক সেই সময়েই ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট ঢুকিয়ে দেয়।

প্রতিযোগিতা শুধু ওই বরাত পাওয়ার জন্য। সেটায় অবশ্য স্বপনের কোন হাত নেই। পরিমলদা একদিন বুঝিয়ে ছিল এসব নাকি কোম্পানির কম্পিউটার অনেক জটিল হিসেব করে ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ কোন দোকানের অর্ডার আছে, তার কাছাকাছি কোন ডেলিভারি বয় ফাঁকা আছে ইত্যাদি। এইসব স্বপন মাথায় নেয় না। লক্ষ্য রাখে যাতে কোম্পানির লক্ষ্য পূরণ ছাপিয়ে বাড়তি ডেলিভারি করে বোনাস পায়। ঘরে নতুন অতিথি আসছে। সামনে অনেক খরচ।

প্যাডেলে স্পিড তুলে নির্দিষ্ট দোকানে পৌঁছিয়ে কাউন্টারে গিয়ে স্বপন নিজের অর্ডার নাম্বারের পিন বলল। কাউন্টারের মেয়েটা একটা খাতা এগিয়ে দিল। অধিকাংশ দোকানের মত এই দোকানেরও এক নিয়ম। খাতায় পিন বা ডিডি আর নিজের মোবাইল নাম্বারটা লিখতে হবে। স্বপন সেটা ঝটপট লিখে দেওয়ার পর কাউন্টারের মেয়েটা দোকানের মোবাইলে ওগুলো এন্ট্রি করার পর দুটো বাক্সর ওপর কোম্পানির স্টিকার লাগাতে লাগাতে বলল, ''বড় বাক্সটাতে আইসিং করা কেক আছে। সাবধানে।''

এটা না বললেও চলত। কারণ স্বপন কখনো অনুমান করার চেষ্টা করে না বাক্সের মধ্যে কী রয়েছে। শুধু জানে এই বাক্সগুলো নির্দিষ্ট ঠিকানায় কাস্টমারের কাছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে হবে। এটা শুধু স্বপনের ইচ্ছায় নয়, কোম্পানির কম্পিউটারও হিসেব রাখে ডেলিভারি বয় কখন পিকআপ করছে আর কাস্টমারের দোরগোড়ায় কখন পৌঁছে দিচ্ছে। বরাদ্দ সময় পেরিয়ে গেলেই ইন্সেন্টিভটা আর জোটেনা।

বাক্সদুটো নিয়ে মোবাইলে রুট দেখল স্বপন। ডেলিভারি সল্টলেকের ডবল ই ব্লকের। দোকান থেকে আড়াই কিলোমিটার। স্বপন মাথায় রাস্তাটা ছকে নিয়ে দোকান থেকে বের হতে যাবে এমন সময় দোকানের ক্যাশে বসে থাকা লোকটা স্বপনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, ''এই, একটু দাঁড়াওতো।''

তারপর মেয়েটাকে বলল, ''এবার কেকের ওপর নামের বানানটা ঠিক লিখেছিস তো?''

মেয়েটা আমতা আমতা গলায় বলল, ''হ্যাঁ ঠিকইতো লিখেছি, যে রকম অর্ডারে বানান এসেছিল।''

''সব সময় অর্ডারেতো ঠিক বানানটাই আসে। তুই ভুল লিখিস। চেক কর। দুটো কমপ্লেন অলরেডি হয়ে গেছে।''

মেয়েটা বড় বাক্সটা খুলল। তারপর মোবাইল থেকে বানান দেখে জিভ কাটল, ''দুর 'এইচ'টা কেন যে লিখে ফেললাম...''

ক্যাশের লোকটা চোখ বড় বড় করে বলল, ''আবার ভুল করেছিস?''

''আমি এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি।'' মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলল।

স্বপন দেখল একটা বড় গোলাপি সাদা কেক। ক্রিম দিয়ে দারুণ ডিজাইন করা। তার ওপর লেখা রয়েছে 'হ্যাপি বার্থডে সিয়া'। সিয়া, এস এইচ আই এ। মেয়েটা মুখ ছোট করে 'এইচ'টা মুছে ফেলে সিয়া নামটা অনেক কায়দা করে লিখে বলল, ''একটু দেখবেন স্যার?''

লোকটা ক্যাশ কাউন্টার ছেড়ে কেকের ওপরটা দেখে খুব একটা খুশি হলোনা, ''পুরো লেবড়ে ধেবড়ে গুষ্টির তুষ্টি করেছিস। দোকানের রেপুটেশনটা যা করছিস দিন দিন। সেই আমাকে ঠিক করতে হবে।''

স্বপন ততক্ষণে ছটফট করছে। কারণ এরা পিকআপ টাইমটা দিয়ে দিয়েছে। তবে এদের বলে কোনও লাভ নেই। ডেলিভারি বয়দের আর কে পাত্তা দেয়? বেশি বললে হয়ত উল্টে কমপ্লেইন করে দেবে। সময় নষ্ট কার দোষে হচ্ছে সেটা কোম্পানির কম্পিউটার বুঝবে না।

অবশেষে কেকের বাক্সে আবার টেপ লাগানোর পর বাক্স দুটো স্বপন যখন পেল, বারো মিনিট সময় নষ্ট হয়ে গেছে। বাক্সদুটো নিয়ে বেরিয়ে এসে সাইকেলের ক্যারিয়ারে রাখা ডেলিভারি বক্সের মধ্যে রেখে স্বপন প্যাডেলে স্পিড তুলল। যত জোরে পারে সাইকেল চালিয়ে ডেলিভারির ঠিকানায় দিকে এগোতে থাকল স্বপন।

মাঝ রাস্তায় স্বপনের মোবাইলটা বেজে উঠল। ঝুমুরের রিং-টোন। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ফোনটা ধরতে বাধ্য হলো স্বপন।

''খেয়েছ?''

এবার সত্যি কথাটাই বলল স্বপন, ''এই একটা ডেলিভারি আছে। এইটা করেই খেয়ে নেব। সেরকম খিদে এখনও পায়নি।''

ঝুমুর চিন্তিত গলায় বলল, ''না, ডেলিভারি পরে হবে। আগে খেয়ে নাও। আমার মাথার দিব্যি। তোমার লো প্রেসার, সুগার রয়েছে। একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদের কী হবে বলোতো?''

স্বপন মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না, ডেলিভারি সময়টা ইন্সেন্টিভ পাওয়ার

জন্য পেরিয়ে গেছে। লাল দেখাচ্ছে এখন। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ঝুমুরকে বলল, ''ঠিক আছে। তুমি চিন্তা করো না। খেয়ে নিচ্ছি এখন।''

আবার একটা গাছের তলায় দাঁড়াল স্বপন। ডেলিভারি বাক্স থেকে সাদা টিফিন কৌটোটা বার করে রুটি তরকারি খেতে থাকল। আহা, সত্যি ঝুমুরের হাতে ম্যাজিক আছে। কী সুস্বাদু বানিয়েছে তরকারিটা। খাওয়া শেষ করে বোতলের গরম জলটা সবটুকু গলায় ঢেলে আবার সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল। সময় যখন লাল হয়ে গেছে আর তাড়া নেই। এবার ধীরে সুস্থে প্যাডেল করতে লাগলো স্বপন। শুধু বুঝতে পারলনা একটু দূরে একটা বাইক থেকে তার এই খাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী হচ্ছে।

দেবপ্রতিম বলল, ''ডান।''
মৌমিতা বলল, ''আমরা ঠিক কি ভিডিয়ো করছি বলতো?''
''কেন? লাইফ অফ আর ডেলিভারি বয়। কত কিছু হয় ইন বিটুইন দেখছিসতো। কখনও কন্টেনার সিল করছে, কখনও মাছ রাস্তায় ফাঁকা জায়গা বেছে কন্টেনারের সিল খুলে খেয়ে আবার সিল করে দিচ্ছে। এসব কি মানুষ জানে? আর যখন তোর এই ভিডিয়োটা দেখে জানবে তখনই তোর ভিডিয়োটা ভাইরাল হবে।''

৪

ডোরবেল টিপল স্বপন। বাড়ির ভেতর একটা সুরেলা বাজনা বেজে উঠল। কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুললেন এক ভদ্রমহিলা।
''ডেলিভারি আছে ম্যাম।'' স্বপন বিনীত গলায় বলে বাক্সদুটো এগিয়ে দিল।
ভদ্রমহিলা বাক্সদুটো নিয়ে বললেন, ''ও আচ্ছা। পেমেন্ট করা আছে কি?''
''না ম্যাম। ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে।''
''কত?''
''১৯৭০ টাকা ম্যাম।''
''একটু দাঁড়ান, আনছি।'' ভদ্রমহিলা বাক্সদুটো নিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। স্বপন দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। পরিবেশটাই অন্যরকম। স্বপনের মনটা ভাল হয়ে উঠল। এমন সময় একটা ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ে এসে বলল, ''তুমি আমার হ্যাপি বার্থডে কেক এনেছ কাকু?''
খোকন হেসে বলল ''হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থডে।''
''থ্যাঙ্ক ইউ কাকু। আজকে আমার হ্যাপি বার্থডে পার্টি আছে। কেক কাটার সময় তুমি আসবে?''
স্বপন শুকনো হাসল। ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে এগিয়ে এসে চারটে পাঁচশো টাকার নোট দিলেন। স্বপন মানিব্যাগ বের করে ৩০ টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছিল ভদ্রমহিলা বললেন, ''ঠিক আছে, চেঞ্জটা রেখে দিন।''

স্বপন ব্যাকপ্যাক থেকে খালি জলের বোতলটা বার করে ভদ্রমহিলাকে বলল, ''একটু জল হবে ম্যাম?'' ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই বাচ্চা মেয়েটা বলে উঠল, ''কোল্ড ড্রিংক খাবে কাকু?''
ভদ্রমহিলা বিরক্ত মুখে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, ''নিচের সিকিউরিটি গার্ডকে বলুন। ওখানে ড্রিংকিং ওয়াটার ট্যাপ আছে। জল ভরে নিন।''

এমন সময়ে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে উঠে এলো একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে। মেয়েটার হাতে তাক করা ক্যামেরা। ছেলেটা স্বপনকে রীতিমত ধমকে বলে উঠল, ''অ্যাই, তুমি দাঁড়াও। কোথাও যাবেনা।''
ভদ্রমহিলা একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''কী হয়েছে? আপনারা কারা?''
''আমরা ইউটিউবার। সব বলছি ম্যাম। এই লোকটা যে বাক্সগুলো আপনাকে এক্ষুনি ডেলিভারি করল একবার নিয়ে আসবেন?''

ভদ্রমহিলা কেকের বাক্সটা নিয়ে আসতেই দেবপ্রতিম বলল, ''এই দেখুন ম্যাম... সিলটা খুলে আবার লাগানো হয়েছে। কেন জানেন? দেখাচ্ছি আপনাকে আমাদের তোলা ভিডিয়োটা। মৌমিতা তুই ভাল করে সিলটার ছবি তোল। আজকেই আমাদের চ্যানেলে আপলোড করব

ভিডিয়োটা। এগুলো মানুষের জানা দরকার। এবার বাক্সটা খুলুন ম্যাম প্লিজ...''

৫

অন্ধকার নেমে এসেছে। বাতাসে আর লুয়ের ছোবল নেই। বরঙ ঠাণ্ডা একটা হওয়া বইছে। আকাশটা পরিষ্কার। একটু একটু করে ঝিকমিকি তারা ফুটছে। স্বপন সাইকেল চালাচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে পিছনের ক্যারিয়ারে ওই যে ম্যাজিক বাক্স তার মধ্যে যেন একটা জগদ্দল পাথর ভরা আছে। সাইকেলটা যেন আর টানতেই পারছে না। খাবি খাওয়ার মত লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল স্বপন। আজ পর্যন্ত কোনদিন যা মনে হয়নি সেটাই এখন মনে হচ্ছে, ওই তারার দলে মা'ও পিটপিট করে দেখছে।

মা বলত, অন্ধকার অতীতকে কখনও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখবি না। তাহলে অতীত ভবিষ্যতকেও অন্ধকার করে দেবে। আচ্ছা, মা'তো বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি, তাহলে ওই ভারি কথাগুলো শিখেছিল কোথা থেকে? আর কত ঘন্টা মিনিট পেরোতে পারলে বর্তমানটা ঠিক অতীত হয়? হাজার চেষ্টাতেও যে এড়াতে পারছে না কয়েক ঘন্টা আগে ঘটা ঘটনাটা মন থেকে ফেলে দিতে। মনের মধ্যে যেটা জ্বলজ্বল করছে সেটা কি অত সহজে অতীত হয়?

''এইতো ম্যাম, এই দেখুন 'সিয়া' লেখাটা। বুঝতেই পারছেন ট্যাম্পার করা হয়েছে। আমরা শিওর তলার থেকে খানিকটা কেকও খুবলে খেয়েছে এই লোকটা ছিঃ, ছিঃ একটা বাচ্চা মেয়ের বার্থ ডে কেক পর্যন্ত''
''কী বলছেন আপনারা?'' স্বপন আমতা আমতা গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, ''দোকানে ফোন করে দেখুন ওরা বানান ঠিক করেছে।''
''চুপ কর। দেব কানের গোড়ায় এমন একটা যে নিজের নামের বানান ভুলে যাবি।'' দেবপ্রতিম ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।
''আঃ! এইসব ঝামেলা আমার বাড়ির সামনে করবেন না।''
''আপনি এই দেখুন ম্যাম ক্যামেরার স্ক্রিণে। বলছি না সব ভিডিয়োতে রেকর্ড করা আছে। দেখুন, দেখুন প্রথমে এই সাদা কন্টেনারটা দেখুন সিল খুলছে। এটা আবার কার ডেলিভারি ছিল কে জানে''
''আমার আর দেখার দরকার নেই। আর এই যে ভাই তুমি নিয়ে যাও এই এঁটো কেকটা ফেরত।'' ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন।
''কী হয়েছে মাম্মি?''
''তুমি ভেতরে যাও সিয়া।''
কেকের বাক্সটা নিয়ে হতভম্ব হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল স্বপন। পেছন থেকে গলার আওয়াজ পেল, ''ও কাকু, তুমি আমার হ্যাপি বার্থডে কেকটা নিয়ে যাচ্ছ কেন? আরও বড় কেক নিয়ে আসবে?''

কথাগুলো কানের কাছে বাজছে স্বপনের। ছেলেমেয়েগুলো কী যেন বলছিল? ভাইরাল করে দেবে ভিডিয়োটা। হয়ত সেটা হয়েও গেছে। কোম্পানির কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে খবরটা। ওরা তো তাড়িয়ে দেবেই। পরিমলদাও জেনে গেছে। পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, ওই আকাশ ভরা তারা সবাই জেনে গেছে, স্বপন একজন চোর। ডেলিভারির খাবার চুরি করে খায়।

রাস্তার ধারে কয়েকটা ফুটপাথের শিশু খেলছিল। স্বপন সাইকেলটা দাঁড় করাল। ডেলিভারি বক্স থেকে কেকের বাক্সটা বার করে বাচ্চাগুলোর দিকে এগিয়ে বলল, ''খা।''
ওরা মহানন্দে কেক খেতে থাকল খুবলে খুবলে। গালে লাগছে মহার্ঘ আইসিং ক্রিম। চোখের মণিগুলো আকাশের তারাগুলোর চেয়েও বেশি ঝলমল করছে। নাহ, পুরনো সব অতীত ভুলে স্বপনের কানে একটাই গলা ভাসছে,
''ও কাকু, আরও বড় কেক নিয়ে আসবে?''
মোবাইলটা বাজছে। ঝুমুরের রিং-টোন। ঝুমুরও নিশ্চয়ই এইমাত্র জানল...। মোবাইলটা ধরল স্বপন।

''তুমি কোথায়? বাড়ি ফিরে এসোনা! অ্যাই জানো পেটের মধ্যে ও নড়ছে।''

একটু চুপ করে থেকে স্বপন বলল, ''জানো, আমাদের মেয়ে হলে কী নাম রাখব ঠিক করে ফেলেছি, 'সিয়া'।''

গল্প

সল্প

প্যাট্রিসিয়ার কথা

কুমকুম সমাদ্দার, এফ ই ২৪৮

বস্টন শহরের শহরতলির এই পাড়াটায় নতুন এসেছি। অল্প দু'একজন প্রতিবেশীর সাথে যা একটু আধটু আলাপ হয়েছে। কোনোদিন দুপুরের দিকে বাড়ি থাকলে দেখা যায় একজন পোস্টম্যান নির্জন পাড়াটায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করছে। প্রযুক্তিবিদ্যার এত অগ্রগতির পরেও চিঠি বিলি সেই রানারের যুগের মত ঘুরে ঘুরে।

পরনে আকাশি নীল হাফশার্ট, গাঢ় ছাইরঙা লম্বা ঝুলের হাফপ্যান্ট, ডান কাঁধে ভারী চিঠির ব্যাগ, সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ডান দিকে বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে মানুষটা। একদিন আমাদের বাড়ির পোস্ট বক্সে চিঠি দিতে এলে আমার অবাক হবার পালা! এ তো পোস্টম্যান নয়, পোস্টউওম্যান! মহিলা! মাঝ বয়সী। দূর থেকে বোঝা মুস্কিল। বয়কাট চুল। কানে দুটো করে রিং এবং মুখের নারীসুলভ কমনীয় ভাব থেকে বোঝা যায় ইনি মহিলা। আলাপ করলাম। নাম জিজ্ঞেস করতে হেসে বললেন, -- আমাকে সবাই প্যাটি বলেই জানে। আমার নাম প্যাট্রিসিয়া। দশ বছর হ'ল এই কাজ করছি।

এ দেশে সবারই গাড়ী থাকে। কাছে পিঠে কোনা গাড়ী না দেখতে পেয়ে বললাম,

— তোমার গাড়ী কোথায় ?

— গাড়ীটা একটু দূরে পার্ক করেছি। বারবার গাড়ীতে ওঠা, স্টার্ট করা, একটু এগিয়ে আবার পার্ক করা এক বিড়ম্বনা। তারচেয়ে গাড়ীটা কোন সুবিধেমত জায়গায় রেখে কাছাকাছি অঞ্চলটায় হেঁটে চিঠি বিলি করতেই সুবিধে। সেখানটায় কাজ হয়ে গেলে আবার গাড়ীতে উঠে খানিকটা এগিয়ে যাই।

— তা তোমাকে এভাবে রোজ কতটা হাঁটতে হয় ?

— ধরে নাও দিনে দশ থেকে বারো মাইল।

— বল কি? পা ব্যথা করে না তোমার ?

— তা একটু করে বৈকি! তবে সত্যি বলতে কি, এখন আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

— জল খাবে? বা কোন জুস? যা রোদ বাইরে!

— না না। ধন্যবাদ। এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে জল আছে। একটু পরে পরে জল খাই।

প্যাটি চিঠির ব্যাগের ভেতর থেকে জলের বোতল বার করে দেখায়।

— তোমার ব্যাগটা তো বেশ ভারী।

— খুব একটা না। ওই জলের বোতলের জন্যই যা একটু ভারী লাগে। জল খেতে খেতে বোতলটাও তো ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে যায়।

— সপ্তাহে পাঁচ দিন ডিউটি?

— না। শনিবারেও কাজ থাকে। আমি এখন চলি। আরো কিছু চিঠি বিলি করা বাকী আছে।

এরপর থেকে দেখা হলে প্যাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করে। ওর জীবনের টুকিটাকি কথা। প্রথম প্রথম জীবিকার জন্য কোথায় কোথায় কি কি কাজ করেছে ও, এই সব। পাড়ায় ওর আসাটা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সময়ে। নির্জন দুপুরের পাড়ার ছবিটার ফ্রেমে প্যাটি একটা জায়গা করে নিয়েছে। চড়া রোদে মাথায় ক্যাপ চোখে সানগ্লাস পরে প্যাটি চলেছে চিঠির বোঝা নিয়ে। ঝড় বৃষ্টির দিনে একটু অন্য ছবি - পরনে ওয়াটারপ্রুফ আর মাথায় ছাতা।

এদেশে অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করা প্রায় অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে। তবু ওর হাঁটার ধরণে আমার ভারতীয় মানসিকতায় একদিন ওকে প্রশ্নটা করেই ফেলি।

— এত বেশী হাঁটতে হয় বলে পায়ে কি তোমার কোন সমস্যা আছে ?

প্যাট্রিসিয়া একটু চুপ করে থাকে। তারপর ওর স্বভাবসুলভ

স্নিগ্ধ হাসিতে উত্তর দেয়,

— আমার যে ক্যান্সার হয়েছিল, তুমি মনে হচ্ছে জানো না। এখানে অনেকেই জানে। ওভারি এবং কোলোনে হয়েছিল।

— বল কি?

আমি আঁৎকে উঠি।

— কিছু মনে কোরো না প্যাটি। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। এ ভাবে প্রশ্ন করা আমার উচিৎ হয়নি। আমি সত্যি সত্যি অত্যন্ত দুঃখিত।

— না না, কিছু মনে করব কেন? তোমার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। জানো তো— I am a fighter. God does not give me anything that I can not handle.

ঈশ্বরের কৃপায় আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন দিব্যি কাজ করতে পারছি। আর করবনাই বা কেন বল তো? সুস্থ শরীরে কেউ কি শুয়ে বসে দিন কাটায় ? না সেটা করা ঠিক?

এমনিতে ক্যানসার হলে অনেকেই তো বাঁচে না। অথচ দেখ, ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমি সুস্থ হবার পর, প্রথমেই যে কথাটা আমার মনে এসেছিল, সেটা হল ঈশ্বর আমাকে বাঁচালেন কেন? সবাই তো বাঁচে না। নিশ্চয়ই আমার এই বাঁচার পেছনে তাঁর কোন একটা শুভ উদ্দেশ্য আছে। অচিরেই আমি তাঁর সেই উদ্দেশ্যের একটা আভাস পেলাম। সে সব কথা আরেকদিন তোমাকে বলব। আজ নয়। কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে। চলি।

আমি অবাক হয়ে প্যাট্রিসিয়ার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি অসম্ভব মনোবলের অধিকারিনী এই আপাত-সাধারণ মহিলা!

একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে প্যাট্রিসিয়া হাসিমুখে এগিয়ে আসতে, বললাম,

— প্যাটি, তোমার পরিবারের ব্যাপারে আমি কিন্তু আজও কিছু জানি না।

— আমার পরিবার বলতে আমার মা থাকতেন আমার সঙ্গে। তিনিও মারা গেছেন দু'বছর হল। এখন আমার এক মাসী থাকেন আমার সাথে। আসলে তিনি মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। উনিও ক্যানসার পেশেন্ট। বয়স হয়েছে। অথচ ওঁকে দেখাশোনা করবার কেউ নেই। তাই আমিই ওঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমি তো জানি, ক্যানসার হলে কতখানি কষ্ট হয়। এবার বুঝতে পারছ তো ঈশ্বর আমাকে ভাল করে দিলেন কেন? আমার শরীরটা ঠিক করে দিলেন যাতে আমি একজন বৃদ্ধ অসহায় অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এটা করতে পারছি। এ ছাড়া আমার পরিচিত আরো দু'জন ক্যানসার পেশেন্ট আছে। সময় পেলে ওদেরকেও সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা করি। কাউন্সেলিং করি। ওটা খুব দরকার।

স্নিগ্ধ হাসিতে কথাগুলো বলে গেল প্যাট্রিসিয়া, যেন এমনটা না করলেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হত!

সব শোনার পর আমি কি বলব ভাষা খুঁজে পাই না। নিজে একসময় ক্যান্সার পেশেন্ট ছিল। সেরে উঠে এখন চিঠি বিলির কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিত্য দীর্ঘ পথ চলা, ঘরকন্নার কাজ এবং তারপরে ক্যান্সার পেশেন্টদের সেবা যত্ন! ওকে যত দেখছি। ততই অবাক হচ্ছি।

একটা সময় প্যাট্রিসিয়া একটি স্বল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত। পাড়ার লোক চিন্তিত! সবাই ভাবল, প্যাট্রিসিয়া এরার বোধহয় অবসর নিতে চলেছে। ও সবার কাছে চলমান এক আস্থা! প্যাট্রিসিয়া মানে সঠিক ব্যক্তির কাছে সঠিক বার্তাটি পৌঁছে যাওয়া এবং সঠিক সময়ে। খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ওই ছোট মেয়েটি কি তা পারবে? সবার আশঙ্কার উত্তরে প্যাটি সবাইকে আশ্বস্ত করল, ও এখন অবসর নিচ্ছে না। মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে ওকে ট্রেনিং দিতে।

ওকে একদিন প্রশ্ন করলাম,

— তোমাকে তো কখনো ছুটি নিতে দেখিনা?

— হ্যাঁ নিই। সারা বছরে সাত দিন। ক্রিসমাসের সময়। দেখতে দেখতে পাতা ঝরার দিন Fall এসে গেল। রামধনুর এক প্রান্তের তিনটি রঙ হলুদ কমলা ও লাল রঙের কত না মেলানো মেশানো বর্ণের অজস্র ঝরাপাতার উড়ন্ত আঁচল মাটিতে বিছিয়ে এক সময় চলেও গেল। ছেঁড়া ছেঁড়া পাতলা তুলোর মত বরফের বর্ষন শুরু হল নিষ্পত্র গাছগুলোর মাথায়, ঘাসে, পথে ঘাটে সর্বত্র। বিকেল হতে না হতেই

বিষণ্ণ আকাশ। মটিতে পড়ে থাকা বরফ জমে জমে উঁচু। স্কুল, কলেজ, অফিসের কাজকর্ম স্বাভাবিক ছন্দেই চলে। তবে বেরোতে হলে পরতে পরতে শরীরের ওপর চাপাতে হয় নানা রকম শীতবস্ত্র উইন্ডপ্রুফ, আর তার সাথে লম্বা গাম বুট, মোজা, টুপি ইত্যাদি।

খুব প্রয়োজন না হলে রাস্তায় লোকজনের হাঁটাচলা প্রায় নেই বললেই চলে। কাজকর্মের শেষে অধিকাংশই ঘরবন্দী। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। দেখি এরই মধ্যে প্যাট্রিসিয়া চলেছে। আগের ইউনিফর্মের পরিবর্তে পোষাকে পোষাকে প্রায় বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গজয়ের অভিযাত্রী। এত শীতবস্ত্রের ভেতরে ওকে চেনা মুস্কিল। সঙ্গের চিঠির ব্যাগটাই ওকে চিনিয়ে দিছে। পায়ে ভারী বুট জুতো, যার তলায় লোহার cleats অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে শলাকা, তাই লাগানো যাতে বরফের চাদরে পা পিছলে না যায়। চারদিক দিয়ে ঢাকা চশমায় চোখ পুরোপুরি সুরক্ষিত। অনেকের অনেক জরুরী খবর পৌঁছে দেবার দায় ঝুলছে ওর কাঁধে। ঘরবন্দীদের সেসব পৌঁছে না দিলে ওর কাঁধের বোঝা হাল্কা হয় কেমন করে? ও যেন সুকান্তর সেই রানার, যে ''কোনো নিষেধ জানে না মানার''।

সেদিন তুষার ঝড় হবার সম্ভাবনার ঘোষণা ছিল। স্কুল কলেজ অফিসে যায়নি কেউ। যথা সময়ে ঝড় শুরু হ'ল। পড়ন্ত বেলায় ঝড় একটু থিতিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দূরে মনে হল কে যেন আসছে। আরেকটু কাছে আসতে হাঁটার ভঙ্গিতে মানুষটিকে চেনা গেল। এ যে প্যাট্রিসিয়া! ও কি পাগল? পোষাকে পরিবর্তনের মধ্যে চোখের চশমায় ওয়াইপার লাগানো যাতে বরফের গুঁড়ো না জমে।

ছোটবেলা থেকে অনেক মহাজীবনের কর্তব্যবোধের অনেক মহান ঘটনা পড়েছি, যা আমার মনের গভীরে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু আজ আমার চেনা পৃথিবীটার অন্য প্রান্তে, এক সাধারণ জীবনের কর্তব্যনিষ্ঠার যে অসাধারণ ছবিটি দেখতে পেলাম, যে ছবি আমরা দেখেও দেখতে পাই না, দৈনন্দিনের অভ্যাসে অভ্যাসে অস্পষ্ট, সে ছবির ক্যাপসন 'প্যাট্রিসিয়া'।

"বিফলতা আমাদের অকেজো করে, কিন্তু জীবনে যাঁরা জয়ী হয়েছে, বিফলতার উপর ভিত্তি করেই তাঁদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত।''

— আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গল্প

সল্প

সুমনার সাতকাহন

শিবানী চৌধুরী, এফ ই ৪৭৫/৫

''সকাল থেকে সারাক্ষণ কাগজে মুখ গুঁজে বসে না থেকে, মাঝে মাঝে রান্নাঘরে গিয়ে একটু তদারক তো করতে পার'' — সুজিতের গায়ে জ্বালা ধরানো কথাগুলো শুনে সুমনার মেজাজ গরম হয়ে গেল। সেও সমানতালে কথার ছুরি চালালো, ''একটু আগেই তো সব বুঝিয়ে দিয়ে এসে এইমাত্র বসলাম। সারাক্ষণ যদি রান্নাঘরেই থাকবো তাহলে রান্নার লোকের দরকার কি? তাছাড়া পাশে দঁড়িয়ে বেশী টিকটিক করলে দুদিন বাদে পালাবে সে।'' আসলে কালকের রান্নায় সামান্য একটু নুন, তে ল বেশী হয়ে গিয়েছিল বলে আজকের এই বিস্ফোরণ এক আধদিন রান্নায় একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে, সুমনার হাতেও হয় সবার হাতেই হয়। সে কথা মানবে কে? না হলে রান্নার মেয়েটি ভালই রাঁধে। কম তেল মশলায়।

বিয়ের পর তো দীর্ঘ ৩০ বছর সুমনাই রান্না করতেন। ইদানীং হাই প্রেসার ধরা পড়ায় ডাক্তার আগুনের তাতে বেশি থাকতে বারণ করায় রান্নার লোকের ব্যবস্থা। সকাল থেকে চা পর্ব শুরু। দু'রকম চা, গ্রীন টি, রেড টি (চিনি দুধ ছাড়া) শুধু তাই নয় সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ছোট এক বাটি। আদা কুচি, কাঁচা হলুদ কুচি দিয়ে। রাতে ভেজানো আমন্ড কয়েকটা, কিছু ড্রাই ফ্রুট, বিস্কিট তো থাকবেই। সবকিছু তো সুমনাই গুছিয়ে দেয়। নিজেও খায়। অবশ্য ঘন্টাখানেক পরে ব্রেকফাস্ট পর্ব। এক একদিন এক এক রকম সিরিয়াল। তাছাড়া স্যালাড, মরসুমী ফল দু তিন রকম সেগুলো সাজিয়ে টেবিলে দেবার হ্যাপা কম? তারপর দুপুরে, রাতের লাঞ্চ ডিনার। সুজিত খুবই স্বাস্থ্য সচেতন বলে প্রোটিন ডায়েট মাছ, মাংসের সঙ্গে ব্যালেন্সড ডায়েট থাকে। সবজী তো রাখতেই হবে। এগুলো যেন টেবিলে আপনা আপনি এসে হাজির হয়! চিন্তাভাবনা করে গুছিয়ে দিতে হয় না? তবু শুনতে হবে বই কাগজে মুখ গুঁজে বসে থাকার টিপ্পনী। আসলে সুমনার সমস্যাটা অন্য জায়গায়। বছর সাত আট আগে কয়েকদিন প্রচন্ড মাথা ঘোরায় ভুগেছিলেন। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন ভার্টিগো। নানা রকম ওষুধ খেয়ে তো সুস্থ হলেন। কিন্তু তারপর থেকেই কানে কম শোনা শুরু হলো। আস্তে আস্তে কথা বললে তো শুনতেই পান না। হিয়ারিং এইড ব্যবহার করলেও আওয়াজটাই জোরে শুনতে পান কিন্তু কথাগুলো বোধগম্য হয় না। বিশেষ করে তাড়াতাড়ি বললে তো কিছুই বুঝতে পারেন না। ডাক্তারের মতে ভার্টিগোর ফলে ব্রেন কিছুটা এফেক্টেড হয়েছে তার ফলে এই বিপত্তি! ''ত বু আপনি নিয়মিত ব্যবহার করবেন এতে লজ্জার কিছু নেই। চোখে কম দেখলে লোকে চশমা ব্যবহার করে, তাহলে কানে কম শুনলে হাসাহাসি করার কিছু নেই''। যাকগে এই নিয়ে সাতকাহন লিখে কি লাভ ভুক্তভোগী ছাড়া এই সমস্যা সবাই বুঝবে না। সুমনা বরাবরই একটু অন্তর্মুখী। লোকের সঙ্গে মেলামেশায় সেরকম সপ্রতিভ নন। কথাও বরাবরই কম বলেন। সারাদিন বই, কাগজ পড়ে আর টিভি দেখে সময় কাটান। তবে টিভিতে চলতি বাংলা সিরিয়াল দেখতে একটুও ভালোবাসেন না। একঘেঁয়ে অবাস্তব গল্প। শাশুড়ি বউয়ের তর্জা-কুচুটেপনা, উৎকট সাজগোজ বিরক্তি এসে যায়। এখন নানা রকম ওয়েব সিরিজ ওটিটি প্লাটফর্মে অনেক রকম সিনেমা সিরিয়াল দেখায় সেগুলো দেখে সময় কাটান। আর এগুলোতে বেশিরভাগই সাবটাইটেল দেওয়া থাকে তাই বুঝতে সুবিধা হয়।

তবে আজকাল সুমনার মনে আর একটা চিন্তার উদয় হয়েছে, বয়স তো সমানে বাড়ছে। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের দোরগোড়ায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন চলাফেরার মধ্যে থাকতে পারেন। বিছানায় যেন শয্যাশায়ী না হয়ে পড়েন। দাদু, ঠাকুমা, বাবা সবারই যা অবস্থা হয়েছিল,

সেসব অভিজ্ঞতা থেকে এই দুশ্চিন্তার উৎপত্তি! তাই নিয়মিত এক্সারসাইজ করে নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা করেন। ছোটবেলায় মামার বাড়ির পাশের পুকুরে চান করতে গিয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছিলেন, মা তাই বাড়ির কাছে হেদুয়ায় সাঁতারের ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন সেই শিক্ষা এখন কাজে লাগছে গরমকালে ভোরবেলা গিয়ে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটা আর শীতকালে মর্নিং ওয়াক বাঁধা ধরা। স্বাস্থ্য সচেতন সঙ্গী সুজিত এ ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠ।

ছোটবেলায় বাবার বন্ধু আয়রন ম্যান নীলমণি দাসের চার্ট দেখে নানা রকম ব্যায়ামের অভ্যাস ছিল। তাই ৭০ পেরিয়ে গেলেও হাঁটু, কোমর, কাঁধ, হাতে ব্যাথার নানারকম এক্সারসাইজ নিয়মিত করতে কোনও অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে সুমনাকে 'এক্সারসাইজ হলিক' (কথাটা কি ঠিক হলো) বলা যেতে পারে!

আরেকটা সমস্যা হল ভুলে যাওয়া। বয়স বাড়লে কম বেশি সবাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু সুমনা কম বয়স থেকেই একটু ভুলোমনা। অন্যমনস্ক। তার ফলে ছোটবেলা মা-বাবার কাছে কম বকুনি খেতে হয়নি। আর এখন তো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনে শুনে গা সহা হয়ে গেছে! ক'দিন আগেই যাকে নিয়ে দুজনে এত কথা বললেন, কাউকে বলতে গিয়ে তার নামটাই সহজে মনে করতে পারলেন না। দু-তিন দিন বাদে হয়তো হঠাৎ মনে পড়ল। টিভিতে, কাগজে, ম্যাগাজিনে ডিমেনশিয়া, অ্যালঝাইমার্স নিয়ে এত আলোচনা, লেখালেখি দেখে মনে ভয় ধরে যায় সুমনার। যদি উনিও কোনদিন রাস্তায় বেরিয়ে আর বাড়ির ঠিকানা মনে না করতে পারেন — যেমন ঘটনা প্রায়ই কাগজে পড়েন। কিছুদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলেন রোজ যদি জিভ বার করে সার্কেলের মতো ডাইনে-বাঁয়ে দশবার দুবেলা ঘোরানো যায় তাহলে এই রোগের আশঙ্কা একটু কম থাকে। তারপর থেকে এই এক্সারসাইজও দুবেলা শুরু হয়েছে। আজ প্রায় ৩৫ বছর হতে চলল সুমনারা সল্টলেকে এসেছেন। যদিও বাড়ি নয় কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট। তবু নিজস্ব ফ্ল্যাট বলে খুশীই ছিলেন বেশ। আস্তে আস্তে আশেপাশের অনেকের সঙ্গে আলাপ হোল। বন্ধুত্ব হোল। তাদের বেশিরভাগই নিজেদের একতলা দোতলা বাড়ি, বাগান, তাই নিয়ে কথায় বার্তায় একটু প্রচ্ছন্ন গর্বের আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু ক্রমশ দিনকাল পাল্টাতে লাগলো। সবারই বয়স বাড়তে শুরু করল। সেই সঙ্গে চুরি ডাকাতির ফলে নিরাপত্তার দিক দিয়ে সমস্যা শুরু হল। তাছাড়া একতলা দোতলা বাড়ি পরিষ্কার রাখা মস্ত কাজ। বিশেষ করে করোনার দুর্যোগের সময় যখন লকডাউন শুরু হল তখন তো অসুবিধার চূড়ান্ত, কিন্তু ফ্ল্যাট হওয়ায় সুমনারা সেদিক দিয়ে অনেক রিলিফ পেয়েছেন। নিরাপত্তার দিক দিয়েও সুবিধা। বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে বা মাঝে মাঝে যখন দু-তিন মাস আমেরিকায় ছেলের কাছে থাকতে যান তখন এত দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় না। কেয়ারটেকার নীচে থাকে। তাছাড়া আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরাও পরিচিত। তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বই কাগজ পড়ার অভ্যাস থাকায় সুমনার সময় কাটানোর কোন সমস্যা নেই যেটা নাকি তার পরিচিতদের মধ্যে অনেকের আছে। সন্ধ্যাবেলা টিভি দেখেন। এখন তো প্রচুর চ্যানেল হয়েছে, পাল্টে পাল্টে নিজের পছন্দমত প্রোগ্রাম দেখেন। তাছাড়া ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপেও অনেকটা সময় কাটে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের, বিশেষ করে যারা বয়স্ক, রোজ সকালে গুড মর্নিং জানানোর মধ্যেও একরকম সমাজসেবা আছে বলে মনে করেন। যদিও অনেকে এটা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে, কিন্তু সুমনার মনে হয় এটা প্রয়োজন। বয়স্করা অনেকেই একা একা থাকেন। ছেলে মেয়ে বিদেশে। রোজ সকালে তাদের কাছ থেকে গুড মর্নিং বার্তা পেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগে। দু একবার এরকম হয়েছে কয়েকদিন পর পর গুড মর্নিং না পেয়ে সুমনা ফোনে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে তিনি অসুস্থ। তখন প্রয়োজনমতো সাহায্য করেছেন। ফেসবুকেও 'আস্থা' বলে একটা ভার্চুয়াল গ্রুপের সদস্য হয়েছেন সুমনা। সদস্যরা বেশিরভাগই বয়স্ক। জ্ঞানী, গুণী, বিদুষী। তাদের সঙ্গে নানা রকম মতের বিনিময় হয়। তাদের পাঠানো গল্প, কবিতা, রম্যরচনা খুবই উপভোগ করেন। একজন সদস্যা প্রায়ই বিভিন্ন ইংরেজি গল্পের, বিশেষ করে রবার্ট ডালের গল্প এত সুন্দর বাংলায় অনুবাদ করেন যে মনেই হয় না ওটা অনুবাদ। এক ভদ্রলোক জাহাজে কাজের সুবাদে প্রায় গোটা পৃথিবী ঘুরেছেন। তিনি তার নানারকম অভিজ্ঞতার কথা

বেশ সরস সহজ ভাষায় লেখেন। আর একজন নেভীতে ডাক্তার ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের মজার অভিজ্ঞতার কথা, কাজের সূত্রে দেশে-বিদেশে ঘোরার নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বেশ সরস ভাষায় পরিবেশন করেন। সেগুলো পড়তে পড়তেই দিনের অনেকটা সময় কাটে! মাঝে মাঝে বিশেষ করে শীতকালে পিকনিক বা নানা গানের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে সদস্যরা একত্রিত হ'ন, আলাপ পরিচয় গল্পগাছায় সুন্দর সময় কেটে যায়।

তবে ফেসবুককে অনেকেই প্রচারের ঢক্কানিনাদে ভরিয়ে দেন। কে কোন ফাইভ স্টার হোটেলে বার্থ ডে পার্টি দিল বা খেতে গেলো বা বিদেশে বেড়াতে গিয়ে কোন বড় হোটেলে উঠেছিল বা বাড়ীতে কোনও বিশেষ রান্না করে তার ছবি পোস্ট করে সবাইকে জানানো আর নানারকম রীল বানিয়ে আত্মপ্রচার — এগুলো দেখলে সুমনার মন বিরক্তিতে ভরে যায়। যদিও পারতপক্ষে এগুলো দেখতে চান না তবু কখনো কখনো চোখে পড়ে যায়।

প্রায় ৩৫ বছর হয়ে গেল সুমনারা সল্টলেকে এসেছেন। প্রথম কয়েক বছর বেশ উৎসাহ নিয়ে এই ব্লকের দুর্গাপূজার আয়োজনে যোগ দিতেন। কিন্তু ক্রমশ আবাসিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূজার আয়োজনের আড়ম্বরও বাড়তে লাগল। আগের আন্তরিকতা আর খুঁজে পেতেন না। একদিন ভোগের রান্নার আয়োজনে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ভেদাভেদ নিয়ে বেশ মনান্তরই ঘটে গেল কয়েকজনের সঙ্গে। সার্বজনীন পুজোর আয়োজনে এত জাতপাত ভেদ মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না সুমনা। বীতশ্রদ্ধ হয়ে পূজার কাজ ছেড়েই দিলেন।

কোনো তীর্থস্থানে বা মন্দিরে গেলে দূর থেকেই দেবতা দর্শন করেন। পান্ডা বা পুরোহিতের দাপট বা ব্যবহার দেখলে মনে ভক্তির বদলে অভক্তি চলে আসে।

যুগের পরিবর্দনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার আয়োজন ও আড়ম্বরের মাত্রা যেন ক্রমশই বাড়ছে সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে প্রতিযোগিতা দেশের সর্বত্র। বিভিন্ন পূজা প্রাঙ্গণ কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। মিডিয়াগুলো আর কর্পোরেট সংস্থাগুলোও তাদের প্রচার বাড়াবার জন্য নানারকম পুরস্কারের ঘোষণা করে এই হুজুগে তাল মেলাচ্ছে। গত বছর ইউএনও থেকে সার্বজনীন দুর্গাপূজা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় উচ্ছ্বাসের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। আগে দেবীপক্ষ পড়ার পর পূজোর উদ্বোধন শুরু হতো কিন্তু গত বছর তো পিতৃপক্ষেই অনেক জায়গায় উদ্বোধন শুরু হয়ে গিয়েছিল!

সুমনার মনে হয় সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের হাত ধরে মানুষ একদিকে যেমনই এগিয়ে চলেছে আলোর উৎসের সন্ধানে, অন্যদিকে ধর্ম, কুসংস্কার যেন তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে অন্ধকার জগতের দিকে টানছে। শিক্ষিত মানুষেরাও কিভাবে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের বোধবুদ্ধি বিসর্জন দিতে পারে দেখলে অবাক হতে হয়! আর মানুষের মনের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার দিকটাকেই মূলধন করে নিত্য নতুন আবির্ভাব হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মগুরু ও ধর্ম স্থানের — দুর্বল মানুষের মনে খুব সহজেই তারা প্রভাব বিস্তার করছে। নানারকম যাগযজ্ঞ, মাদুলি, তাবিজ, বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে একশ্রেণীর মানুষদের তারা এমন মোহচ্ছন্ন করে রাখছে যে তাদের যুক্তি, বুদ্ধি সব যেন লোপপেয়ে যাচ্ছে। আর এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আসরে নেমেছে ভন্ড জ্যোতিষীর দল। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে, খবরের কাগজের পাতায় তাদের ছবিসহ গুণাবলীর বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপনের ভাষায় প্রলুব্ধ হয় দলে দলে দুর্বলচিত্ত মানুষেরাও ভিড় করছে তাদের চেম্বারে। আর সোনার দোকানের যোগ সাজশে তাদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে। আজকাল ছেলে-বুড়ো, কলেজ পড়ুয়া, চাকরীজীবী, তরুন তরুণী সবার আঙ্গুলে আংটির ছড়াছড়ি! পারলে দশ আঙ্গুলে দশটি আংটি। পরলে যেন সব কুপিত গ্রহ-নক্ষত্রদের জব্দ করা যাবে। আর সেই সঙ্গে সুমনা লক্ষ্য করে দেখেছেন বিপত্তারিণী ব্রতের লাল সুতোর রমরমা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাধারণ লোক থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিশিষ্ট বলে পরিচিত শিল্পী, অভিনেতা, খেলোয়াড়, গায়ক-গায়িকা প্রায় বেশীরভাগের হাতে সেই লাল সুতো বাঁধা। যেন বিপদকে গণ্ডি কেটে আটকানোর চেষ্টা। এসব কাণ্ডকারখানা দেখলে সুমনার মনে প্রশ্ন জাগে

আমরা কি সভ্যতার পথে এগোচ্ছি না পিছিয়ে যাচ্ছি?

কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর পড়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন সুমনা। শাসকগোষ্ঠীকে খুশী রাখার জন্য সিএসআইআর এর (জনগণের টাকায় যার ফান্ড চলে) একদল বিজ্ঞানী কিভাবে ২০২৪ সালের রামনবমীর দিন সূর্যের প্রথম আলো যাতে অযোধ্যার রাম মন্দিরের রামলালার মুখের উপর প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আমজনতার এতে কি উপকার হবে সে প্রশ্ন কে করবে?

স্বামী বিবেকানন্দ তো বহুদিন আগেই বলে গিয়েছেন,
''বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।''
পুণ্য অর্জনের জন্য আমরা যদি মন্দিরে মন্দিরে ধর্ণা না দিয়ে, ধর্মীয় গুরুদের চরণ আশ্রয় না করে, দরিদ্র অসহায় মানুষদের সেবায় নিজেদের কাজে লাগাতে পারি তাহলে তার চেয়ে পুণ্য আর কিছুই নয়।

বড় বড় মন্দিরে বহুনামী দামী ভক্তরা, বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা, সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কোটি কোটি টাকার সোনা গয়না, হীরে-জহরত দান করেন পূণ্য অর্জনের আশায়। অথচ আমাদের দেশ এত গরীব! প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে স্কুল, ডাক্তার, হাসপাতাল নেই। খাবার জল নেই। মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয় গ্রামের লোকেদের একটু খাবার জল পাবার জন্য। অথবা অসুস্থ হলে চিকিৎসা পাবার জন্য।

মন্দিরে দান করা টাকা মন্দিরে না রেখে যদি ওইসব গরীবদের জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরী করা হতো তাহলে অনেক বেশী পুণ্য সঞ্চয় করা যেত বলে মনে হয় সুমনার। অবশ্য কিছু কিছু সংস্থা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেসব কাজে এগিয়ে আসে না তা বলাটা ভুল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

আসলে এর জন্য প্রথমে দরকার সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে কলেজের বড় বড় ডিগ্রী নিলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। তার জন্য চাই উদার ও মরমিয়া মন, যা সহানুভূতি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে অসহায় নিপীড়িত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ জয়ী কৈলাস সত্যার্থীর কথা, যিনি ইঞ্জিনীয়ার হয়েও মোটা মাইনের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে গরীব অসহায় শিশুদের উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এরকম বেশ কিছু কৈলাস যদি আমাদের দেশে জন্মায় তাহলে সমাজটা কিছুটা বদলাবে আশা করা যায়। কেননা শিশুরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ।

আশার কথা কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কিছু কর্পোরেট সংস্থা ও তাদের সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য দরিদ্র, অসহায়, প্রান্তিক মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য।

কবে সেই সুদিন আসবে যেদিন আমরা একটা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারব —সেই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকেন সুমনা।

"দুঃখের মত বেদনাদায়ক কোন আঘাত নেই ,
মিথ্যার মত ধারালো কোন তীর নেই ''

— ভগবান গৌতম বুদ্ধ

গল্প

সল্প

অভিনয়

তথাগত ভট্টাচার্য, এফ ই ১৪৮

নিজের মৃত্যুর দৃশ্যটা এই প্রথম নিজে হাতে রচনা করলো ত্র্যম্বক।

প্রতি বছরের মত এবছরেও মহালয়ার আগের দিন রাত্রে কলকাতা পৌঁছেছে ত্র্যম্বক। নিবারণকে দিয়ে রেডিওটা ও আগেই ঠিক করিয়ে রেখেছিল। মহালয়া থেকে পুজোর কটা দিন সে কলকাতায় কাটায়। বান্দ্রার বারো তলার ফ্ল্যাট থেকে অনেকটা আকাশ দেখা গেলেও, মাটি থেকে ও বড্ড দূরে থাকে। তাই অন্তত পুজোর কটা দিন ও কলকাতায় থাকে। নিজের অভিনয় জীবনের শৈশবে কেনা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এই প্রাচীন বাড়িটায় ও শেকড়ের গন্ধ পায়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। তবে, শুধু পুজোর কটা দিন কলকাতায় কাটানোর লোভেই যে ত্র্যম্বক সব কাজ ফেলে পড়ি কি মরি করে গত সতেরো বছর ধরে মহালয়ার আগের দিন কলকাতায় হাজির হয়, তা নয়।

ভবানীপুরে ত্র্যম্বকের পৈতৃক বাড়ি। উনিশ বছর আগে, এক ভোররাতের প্রায়ান্ধকারে বাড়িটাকে শেষ বার দেখেছিল সে। আর অন্ততঃ একটি বার ও-বাড়ির উঠোনে সে দাঁড়াতে চায়, ছুঁয়ে দেখতে চায় সেই নোনাধরা বিশ ইঞ্চির দেওয়াল, ঘুমোতে চায় করীবড়গার ছাদের নিচে। দেখতে চায়, শিশুবেলায় ওর হাতে পোঁতা সেই বকুল গাছটা আজও বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেঁচে আছে কিনা। বৃদ্ধা মায়ের শীর্ণ হাতের স্পর্শে তৃপ্তিতে চোখ বুঝতে চায় সে। অন্ততঃ একটি বার। কিন্তু....

এই ছোট্ট যুক্তাক্ষরটি ঘটনা-উপঘটনা, মান-অভিমান এবং ভুল বোঝাবুঝির প্রলেপে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে এখন এক পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। পিঠে সাফল্যের প্রকাণ্ড পাথরটা নিয়ে সেই পাহাড়টাকেই অতিক্রম করার চেষ্টা করে চলেছে ত্র্যম্বক। গত সতেরো বছর ধরে। আজ এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের সমাপ্তি। আজ ওই পাহাড়টা জিতে গেল।

ভোর হতে আর অল্পক্ষণ বাকি। আজ দুর্গাষষ্ঠী। দেবীর বোধন। শহর জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ। একটু পরেই সরগরম হয়ে উঠবে শহর। কিন্তু ত্র্যম্বকের বাড়িটা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। উৎসবের এই জৌলুস যেন এই বাড়ির কঠিন প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। অথবা, বিষণতার ধূসর কুয়াশায় নিজেকে আর চিনতে পারে না। তাই কেউ জানতে পারলো না, এ শহরের প্রাণকেন্দ্রে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা এখন মৃত্যুর কাছে আশ্রয় চাইছে।

কব্জির শিরার ওপর ব্লেড চালিয়ে নিস্পলক দৃষ্টিতে রক্তক্ষরণ দেখছে ত্র্যম্বক। তার শরীর থেকে নিঃসৃত লোহিত কণিকারা ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে আকাশে, জন্ম দিচ্ছে একটা নতুন দিনের।

-'এ বছর কি ত্র্যম্বক চ্যাটার্জী বিয়ে করছেন?'
ত্র্যম্বক সামান্য হেসে বললো, 'নাহ এখনো তেমন কোনো প্ল্যান নেই।' সুশ্রী তরুণী সাংবাদিকের চোখের কোণে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, 'আপনি বোধহয় জানেন না, ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ওয়েট করে আছে বলিউডের ওয়ান অফ দ্যা মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলরের বিয়ে দেখবে বলে।'
-'তাই নাকি। কিন্তু এলিজিবল ব্যাচেলর যে একজন এলিজিবল পাত্রীই পাচ্ছে না!'
-'কাম অন, ডোন্ট সে দ্যাট। আপনি কি জানেন, ইন্ডাস্ট্রিতে একমাত্র আপনারই ফিমেল ফ্যানের সংখ্যা একজন সো কল্ড হিরোর ফ্যান ফলোয়ারের সংখ্যাকে টেক্কা দিতে পারে,

এত বছর ধরে নেগেটিভ রোল করার পরেও ?'

ত্র্যম্বক স্তুতিটা মেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো।

মেয়েটা আবার প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, আপনি কি সত্যি সত্যিই সিঙ্গল ? নাকি কলকাতায় কারো সঙ্গে চুপি চুপি ডেট করছেন ?'

ত্র্যম্বক একটা সিগারেট ধরাল, 'করলে কি আপনারা জানতে পারতেন না ? আমি কী দিয়ে ব্রেকফাস্ট করি, রাতে ক'পেগ ড্রিংক করি- কোনোকিছুই তো আপনাদের কলম এড়িয়ে করার উপায় নেই।'

-'সেটা কি আপনার খারাপ লাগে ?'

-' লাগে বই কী। কিন্তু কী করবো বলুন ? এ জীবন তো আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, এই স্টারডমের জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।'

ইতিমধ্যে সাংবাদিক মেয়েটি ত্র্যম্বকের মেকাপ ভ্যানের অন্দরসজ্জায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছে।

প্রসাধন টেবিলের ওপর রাখা একটা মাঝারি মাপের আয়নাকে দেখিয়ে বললো, 'এই আয়নাটার কোনো স্পেশালিটি আছে ? এর আগেও আপনার মেকাপ ভ্যানে এটা দেখেছিলাম।'

ত্র্যম্বক হাসলো, 'আছে বই কী ! দেখছেন না, আয়নার ফ্রেমটা হাতির দাঁতের ?' মেয়েটি অবাক হল, 'তাই নাকি ! ওটা আইভরি ? তাহলে তো খুব দামী। ওটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন কেন ?'

ত্র্যম্বক সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললো, 'আমার কাছে ওটা খুব লাকি। আমার অভিনয় জীবন শুরুর অনেক আগে থেকেই ওটা আমার সঙ্গে থাকে।'

'হাউ নাইস ! আচ্ছা...'

-'আজ আর নয়। আজ আমার একটু তাড়া আছে। ফ্লাইট ধরতে হবে। পরে আবার কথা হবে, কেমন ?'

সাংবাদিকটিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাসি মুখে নমস্কার জানালো ত্র্যম্বক এবং সেক্রেটারিকে ডেকে গাড়ি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল। আজ মহালয়া। আজ সন্ধ্যার আকাশযানে কলকাতা পৌঁছতে হবে তাকে। আরও একবার।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে থাকার সময় ফোনটা এসেছিল। মিমি। দাদার ছোট মেয়ে। ও-বাড়ির এই একজনের সঙ্গেই একটা ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল। বছর চারেক আগে, ও বাড়ির ল্যান্ডফোনটা নিষ্ক্রিয় হওয়ার পর অনেক কষ্টে এই একজন সদস্যের ফোন নম্বর জোগাড় করতে পেরেছিল ত্র্যম্বক।

'হ্যালো !'

'কাকাই, তুমি কি আজ আসছো ?'

-'হুম, আসছি তো।' বুকের ভেতর একটু আশার সঞ্চার হচ্ছিল, তাহলে কি....

-'তাড়াতাড়ি এসো। ঠাম্মি আর নেই।'

মিমির শেষ কথাটায় ত্র্যম্বক মুহূর্তের জন্য যেন বধির হয়ে গেল, 'মানে ?' -'মানে ঠাম্মি, তোমাদের মা আর নেই। গত পরশু রাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমি তোমায় অনেকবার ফোন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি।'

ত্র্যম্বক হতভম্ভ হয়ে ফোনটা ওর সেক্রেটারি আদিত্যকে ধরিয়ে দিল। আদিত্য কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফোনটা কেটে দিয়ে এ্যম্বকের পাশে বসলো, 'স্যার, আপকা মাতাজী কি দেহান্ত হো গায়া।'

আদিত্যর কথাগুলো ত্র্যম্বকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে ওর সমস্ত চিন্তাশক্তিকে যেন অবশ করে দিয়েছিল। অসহায় মন তখন আশ্রয় নিয়েছিল স্মৃতির প্রকোষ্ঠে।

সাতাশ বছর আগের একটা দিন। ত্র্যম্বক তখন এগারোয়। তখন থেকেই সে যে কোনো সিনেমা দেখে সেখান থেকে ওর পছন্দের দৃশ্যের সংলাপ নিখুঁত মনে রাখতে পারতো। কোনো এক অজ্ঞাত কারণেই বাংলা ছবির অতিনাটকীয় দৃশ্যগুলো মনে ধরত ত্র্যম্বকের।

ত্র্যম্বকের বাবা, হিরন্ময় বাবুর মৃত্যুর তখন মাসখানেক হয়েছে। সকালের দিকে শকুন্তলা দেবী কোথাও বেরোচ্ছিলেন। হঠাৎ স্বামীর অকালমৃত্যুর পর, তখন তাঁর বড় অসহায় অবস্থা। বড় ছেলে মৈনাক তখন সবে আঠেরোয়। স্বামীর অফিসে ছুটছিলেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলোর আশায়। সাদা খোলের ওপর নীল বুটি দেওয়া তাঁতের শাড়িটার সঙ্গে ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক ছুঁইয়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় মুখোমুখি হলেন ছোটছেলের। ত্র্যম্বক কয়েক মুহূর্ত মাকে দেখে হঠাৎ বলে উঠেছিল, বাহ স্বামীকে খেয়ে তো দেখছি ফুর্তি বেড়ে গেছে তোমার।

বালক ত্র্যম্বকের কাছে এটা ছিল কেবল সদ্য আত্মস্থ করা একটা সংলাপ মাত্র। এ সংলাপের অর্থ ও তীব্রতা বোঝার বয়স তখন তার হয়নি। সে সেদিন কেবল পাশের বাড়িতে চলতে থাকা এক চলতি বাংলা ছবির একটি খল চরিত্রের

অভিনয় নকল করেছিল মাত্র। কিন্তু ওই চড়া দাগের সংলাপ শকুন্তলা দেবী ছেলের বালখিল্যতা ভেবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বাড়ির অন্যান্যরা অনেক বোঝালেও সেদিনের পর থেকে সাদা থান ছাড়া অন্য কোনো বস্ত্র স্পর্শ করেননি তিনি।

মা আর নেই। মায়ের কাছে শেষ বারের মত ক্ষমা চাইতে না পারার কষ্টটা গলার কাছে আটকে ছিল ত্র্যম্বকের।
কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে ত্র্যম্বকের গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল ভবানীপুরের দিকে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। আর যে ফিরে গিয়েও কোনো লাভ নেই! আর ক'টা দিন আগেও যদি ত্র্যম্বক নিজের খোলস ছেড়ে বেরোবার সাহসটুকু সঞ্চয় করতে পারতো !

এতগুলো বছর ধরে বিষাক্ত স্মৃতির ছোবলে বিষে বিষে নীল হয়ে গেছে ত্র্যম্বক। তবুও নিজেকে ভাঙতে পারেনি।
ত্র্যম্বক তখন ক্লাস টেনে। শকুন্তলা দেবী স্বামীর চাকরিটা পেয়ে তখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। অফিসের এক সহকর্মীর সঙ্গে একাকীত্ব ভাগ করে নেওয়ার এক সহজ বন্ধুত্ব হয়েছে। দিব্যেন্দু বিপত্নীক, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেশ হাসিখুশি, আমুদে মানুষ।
একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় শকুন্তলা দেবী ত্র্যম্বকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দিব্যেন্দুদা বলছিলেন, তোর বোধহয় মাধ্যমিকের পর কমার্স নেওয়াটাই ঠিক হবে।' ত্র্যম্বক রুটি চিবোতে চিবোতে বলেছিল, 'ও, তারমানে এখন ওই বাচাল বুড়োটা আমার ফিউচার ঠিক করে দেবে?'
শকুন্তলা দেবী একটু রূঢ় হয়েছিলেন, 'ভদ্র ভাবে কথা বলো বুম্বা। উনি তোমার গুরুজন'।
-'প্লিজ মা, ওই ভাঁড়টাকে তুমি আমার গার্জেন বানিও না।'
-'এ আবার কী কথা! উনি তো তোমার ভালোর জন্যই সাজেস্ট করেছেন। আর তাছাড়া, তুমি তো ওঁকে বেশ পছন্দই করতে। সেদিন তো দেখলাম বেশ হেসে হেসে গল্প করছ।'
ত্র্যম্বক হেসে বলেছিল, 'ওটা অভিনয় মা। অ্যাক্টিং। লোকটার বিশ্বাস হয়েছে তো, আমি ওকে খুব পছন্দ করি?'
শকুন্তলা দেবী অবাক, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। তুমি নিজে ওঁকে তোমার স্ট্যাম্প কালেকশন দেখালে। তারপর অতক্ষণ গল্প করলে, তর্ক করলে'।
ত্র্যম্বক খাওয়া থামিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করো মা, ওই লোকটাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি। বহুত ভাট বকে। অতক্ষণ ধরে স্রেফ অভিনয় করে গেছি। অ্যাক্টিংটা কেমন ছিল বলো?'
শকুন্তলা দেবীও খাওয়া থামিয়েছেন, 'কিন্তু, তুমি তো আমাকেও বললে যে উনি নাকি হেভি লোক'।
-'সরি মা। ওটাও অ্যাক্টিং ছিল। তুমি প্লিজ লোকটাকে আর আমাদের বাড়িতে ডেকো না। ভীষণ ইরিটেটিং।'
শকুন্তলা দেবী আর কিছু বলেননি। কিন্তু ত্র্যম্বক বুঝতে পেরেছিল, মা ভেতরে ভেতরে খান খান হয়ে যাচ্ছিল।
ইশ, তখন যদি ত্র্যম্বক আরেকটু অভিনয়টা করতে পারতো কিন্তু, সেটাই বা করবে কী করে? আসলে দিব্যেন্দু বাবু ত্র্যম্বকের অতটা অপছন্দের ছিল না, যতটা ও প্রকাশ করেছিল। এও তো এক অভিনয়ই।

-'স্যার, ইয়েহি হ্যায় না অ্যাড্রেস?' আদিত্য গাড়িটা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।
ত্র্যম্বক কালো কাঁচের এপার থেকে দেখছিল শৈশবের পাড়া। দীর্ঘ সতেরো বছর পর। ভালো করে দেখবে বলে গাড়ির কাঁচটা নামাতেই এক রমণীকে একটি দশ-বারো বছরের ছেলের সঙ্গে দেখে আবার নিজেকে বন্দী করে নিয়েছিল কালো কাঁচের আড়ালে।
নন্দিতা। ত্র্যম্বকের প্রথম প্রেম। কলেজে পড়ার সময় আলাপ হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। পাশের পাড়াতেই বাড়ি। আলাপের প্রথম দিনেই ত্র্যম্বক জানতে পেরেছিল, দাদার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে ওর। নন্দিতা বোধহয় বয়সেও ত্র্যম্বকের থেকে কিছুটা বড় ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, নন্দিতাকে তেমন পছন্দও ছিল না ত্র্যম্বকের। তবুও লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে একদিন একসঙ্গে চা খেতে খেতে বলেছিল, 'তোমার চোখের কাজলটা ধেবড়ে গেলেই তোমায় বেশি সুন্দর লাগে?'
নন্দিতা অবাক হয়েছিল, 'মানে? আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করছিস? দাদাকে বলে দেব কিন্তু।'
ত্র্যম্বক মুচকি হেসে বলেছিল, 'বা রে, সুন্দরকে সুন্দর বলা মানেই ফ্লার্ট করা বুঝি?'

নন্দিতা শূন্য চায়ের ভাঁড় ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'বুঝলাম। নতুন কলেজে যাচ্ছিস, কারুর প্রেমেটেমে পড়িসনি?'
ত্র্যম্বক মাটির দিকে চোখ রেখে বলেছিল, 'কলেজে আর যাই কোথায়? রোজই তো লাইব্রেরী এসে বসে থাকি।'
-'সে কী কলেজে ক্লাস না করলে বিপদে পড়বি কিন্তু।'
ত্র্যম্বক অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কলেজে গেলেও কি আর ক্লাস করতে পারি? মনটা এখানেই পড়ে থাকে।'
নন্দিতা সহজ হওয়ার চেষ্টা করেছিল, 'কেন? এখানে কাউকে মনে ধরেছে নাকি?' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ত্র্যম্বক বলেছিল, 'মনে ধরলেই বা কী? তার মনে তো অন্য কারুর বাস।'
কথাগুলো বলে সেদিন আর দাঁড়ায়নি ত্র্যম্বক। একা একাই বাস ধরতে ছুটেছিল। নন্দিতাও পরদিন থেকে একটু এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল ত্র্যম্বককে। কিন্তু আসা যাওয়ার পথে, বাসস্টপে লাইব্রেরীর নিস্তব্ধতায় ত্র্যম্বকের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ছুঁয়ে যেত নন্দিতাকে। বেশ কিছুদিন পর, একদিন নন্দিতাই গিয়ে বলেছিল ত্র্যম্বককে, 'কেন এভাবে সময় নষ্ট করছিস, ত্র্যম্বক। তুই তো জানিস....'
-'জানি। সেই জন্যেই তো আমি তোমায় কিছু বলতে চাইনি, নন্দিতা। ইনফ্যাক্ট, এখনো বলছি না। কিন্তু, আমার ভালোবাসাকে আমি তো আমার মত করে উপভোগ করতেই পারি, তাই না?'
'কিন্তু, এতে তো কোনো লাভ নেই, ত্র্যম্বক।'
ত্র্যম্বক বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, 'ভালোবাসায় তোমরা বুঝি লাভ লোকসানের হিসেব করো?'
নন্দিতা অধৈর্য্য হয়েছিল, 'ন্যাকামো করিস না। বি প্র্যাক্টিক্যাল।'
ত্র্যম্বক ওর দুটো ভাসা ভাসা চোখে নন্দিতার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'ওয়াই ইজ ইট বদারিং ইউ?'

ত্র্যম্বক সুদর্শন। ওর চোখে একটা সম্মোহনী মায়া আছে। নন্দিতা সেই মায়াময় দৃষ্টি আর এই দূর থেকে ভালোবেসে যাওয়ার অদম্য রোমান্টিকতা থেকে নিজেকে বেশিদিন দূরে রাখতে পারেনি। খবরটা মৈনাকের কানেও পৌঁছল।
-'এ সব কী শুনছি বুম্বা? তুই নাকি নন্দিতার সাথে...'
ত্র্যম্বক খুব স্বাভাবিক স্বরে বলেছিল, 'ও কিছু না। একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, হয়ে গেছে।'
'মানে? কিসের অ্যাসাইনমেন্ট?' সে তুই বুঝবি না। অ্যাক্টিং-এর অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে বলেদিস, আমি ওর সঙ্গে জাস্ট অ্যাক্টিং করছিলাম। রোমান্টিক রোল কী ভাবে প্লে করতে হয়...'
-'ওয়ান্ডারফুল' দরজায় নন্দিতা।
ত্র্যম্বক কিছু বলে ওঠার আগেই নন্দিতা ত্র্যম্বকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'তুমি কি মানুষ? পৃথিবীর সবকিছুই তোমার কাছে স্রেফ অভিনয়? সেটা মিটে গেছে বলেই গত চারদিন ধরে আমাকে অ্যাভয়েড করছ? এতগুলো মাস ধরে যে কথাগুলো আমায় বললে, যে মুহূর্তগুলো কাটালে সব জাস্ট অ্যাক্টিং!' ত্র্যম্বক কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

সেদিন ওর খারাপ লেগেছিল নন্দিতার জন্য। কিন্তু অভিনয়ের নেশায় সে তখন অচেতন। তার মনে তখন আদর্শ রোমান্টিক চরিত্র নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলার সাফল্যের দ্যুতি।

এরপর থেকেই বাড়িটা ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠলো ত্র্যম্বকের কাছে। ওর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ওর অভিনয়ের প্রশংসা করতো। কিন্তু, কেউ ওকে বিশ্বাস করতো না। দিনের পর দিন এই অবিশ্বাসের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে একদিন হাঁফিয়ে উঠেছিল ত্র্যম্বক।

অবশেষে, একদিন ভোররাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সে।

ক্রমশ শীত করতে লাগলো ত্র্যম্বকের। এখন তো পুজোর সময় তেমন ঠান্ডা পড়েনা। তবে কি তিনি এসে গেছেন? তৃপ্তিতে চোখ বুজলো ত্র্যম্বক। অবশেষে মুক্তি এই অভিশপ্ত জীবন থেকে।

মুম্বই চলে আসার পর ত্র্যম্বকের অভিনয়ের প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রম ওকে অচিরেই সাফল্য এনে দিয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রিতে একটু জায়গা করে নেওয়ার পর আলাপ হয়েছিল বৈদেহীর সঙ্গে।
সেদিন বৈদেহীর সঙ্গে সান্ধ্যকালীন মিলন সমাপ্ত করে ত্র্যম্বক যখন আমার সামনে এলো, আমি ওকে প্রশ্ন করেছিলাম,

‘এটা তুমি কী করছ ত্র্যম্বক?
ত্র্যম্বক আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, ‘কেন, প্রেম।’
আমি খিলখিল করে হেসে উঠেছিলাম, ‘তাই বুঝি? ভালো করে ভেবে বলো। প্রেম? না অভিনয়?’
ত্র্যম্বকের মুখটা নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল, ‘যাহ কী বলছো তুমি? এ তো প্রেম। আমি বৈদেহীকে ভালোবাসি।’
-‘তাই নাকি?’
-‘হ্যাঁ, সত্যি... আমি...’
-‘তুমি অভিনয় ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারোনা ত্র্যম্বক।’
-‘কী বলছো তুমি’
-‘ঠিকই বলছি। তুমি ওকে ছেড়ে দাও। ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিও না।’
-‘কিন্তু...’
-‘কোন কিন্তু নেই। নন্দিতাকে মনে নেই তোমার?’
‘হ্যাঁ... কিন্তু ওটা তো.....
-‘তুমি কি ওকে একটুও ভালোবাসোনি?” ত্র্যম্বক কথা হারিয়ে ফেলেছিল, ‘আমি ঠিক জানি না... আমি.....’

সেই শেষ। এরপর আর কারো জন্য মনের দরজা খোলার সাহস পায়নি ত্র্যম্বক। ভেবেছিল প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজের শেকড়ে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু মানুষের মন যে একমুখী। আর বিশ্বাস যে বড় দুর্লভ জিনিস। সে একবার হারিয়ে গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না।

ভবানীপুরের চাটুজ্যে বাড়ির প্রত্যেকে অভিনয়কে ঘৃণা করে। একমাত্র মৈনাকের ছোট মেয়ে, মীনাক্ষীর একটু থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক আছে। তাই সে বাড়ির সকলের অজ্ঞাতে যোগাযোগ রেখেছিল কাকাইয়ের সঙ্গে।
-‘স্যার, আপ ইয়াহা উতরেঙ্গে?’ ত্র্যম্বক নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে গাড়ি ঘোরানোর নির্দেশ দিয়েছিল।

আমার সঙ্গে ত্র্যম্বকের পরিচয় বহুবছর আগে, তখন ওর বছর পাঁচেক বয়স। দুর্গাপুজোর সময় পিলসুজ খুঁজতে গিয়ে ভবানীপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ ত্র্যম্বকের। সেই থেকেই আমি ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ওর জীবনের প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী আমি। আমিই ওর একমাত্র শ্রোতা। আমার সান্নিধ্যেই ওর অভিনয়ের প্রতি প্রেমের জন্ম। আমিই ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছি অভিনয় করতে।

আজ বাড়ি ফেরার পর সারাটা দিন ত্র্যম্বক আমার সঙ্গে কাটালো। মায়ের জন্য কাঁদলো অনেকক্ষণ। তারপর একসময় আমিই ওকে বললাম, ‘কী লাভ আর এই জীবন রেখে?’ আমি জানি, ত্র্যম্বক কোনোদিন আমার কথার অমান্য করবে না। ভোর হওয়ার একটু আগে শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু ছড়িয়ে যখন সে প্রায় মৃত্যুর কোলে, তখন হঠাৎ চোখ খুলে বলে উঠলো, ‘আমি না থাকলে আর তুমি থেকে কী করবে? তুমি তো শুধুই আমার। আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম চিলেকোঠা থেকে, মনে পড়ে? তোমার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। তুমি ডাইনি, তুমি পিশাচিনী। আমার সঙ্গে তোমাকেও মরতে হবে।’
এরপর একটুও সময় নষ্ট না করে ত্র্যম্বক তার শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আছড়ে ফেললো আমায়। হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো আমার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মেঝেয়।

“মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে ।
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।।”

— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প

সল্প

সাত কাপ চা

সুকন্যা চৌধুরী, এফ ই ৪০৮

দুর্গোৎসব সাধারণ বাঙালির কাছে অসাধারণ। কয়েকদিনের ফূর্তি ও উল্লাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকা বাঙালি পুজোর কয়েকদিন সব নিয়মবিধি ভেঙে একটি আনন্দের রেশে মেতে ওঠে - বলাই বাহুল্য। আবার যারা প্রতিমার পুজোকেই প্রাথমিক প্রাধান্য দেন তারা পুজোর ওই কয়েকদিন একটি ধার্মিক ভক্তির উন্মাদনায় মশগুল হয়ে পড়েন। পুজোয় আপনারা এই দুরকমের মানুষ খুঁজে পাবেন। অবশ্য শুধুই যে এই দুরকমের মানুষ আছে তা নয়, পুজোয় মাতোয়ারা জনসাধারণের মধ্যে আপনি হাতে গোনা এমন কিছু ব্যক্তিদেরও খুঁজে পাবেন যারা সেই গতানুগতিক জীবনের নিয়ম পুজোর কয়েকদিনেও মানেন। এই তৃতীয় ভাগের লোকজন পুজোর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে (পুজো আর্চার জন্য নয়) আর রাতে নিয়ম মতো এগারোটা কিংবা বারোটার মধ্যে স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করে। আমি এই তৃতীয় ভাগে পড়তাম।

ধার্মিক আমি নই কিন্তু পুজোর আনন্দ উপভোগ করাতে যে আমি অক্ষম তাও বলা যায় না। সহজ ভাবে বোঝাতে হলে, গোটা রাত ঠাকুর দেখার হুজুগ আমার নেই আর সারাটা সকাল ঘুমিয়ে থাকাটা আমার চেতনায় বাধে। তাছাড়া, যে যেখানে বলুক আমি যেতে রাজি; আর খাবারের অনিয়মও আমি পুজোর চারদিন সহ্য করে নি; এবং প্রত্যেক বছর নিয়মত অষ্টমীর ভিড় এড়িয়ে নবমীর দিনে মাকে অঞ্জলি দি। স্টার, ২৪ ঘন্টা ইত্যাদি নানান খবরের চ্যানেলের চ্যানেল গুলোর ঘোষিত সেরা পুজো, সেরা ঠাকুর, সেরা মন্ডপ, যাবতীয় যা সেরা সবটাই দেখে নি। তবুও ২০২১ অবধি আমার কাছে দুর্গোৎসব তেমন কিছু অসাধারণ ছিল না।

মূর্তি পূজো, ভক্তি, বিশ্বাস সবটারই অর্থ আমার কাছে বদলে যায় ২০২২ এর নবমীর রাতে। ঘড়িতে তখন দশটা। জমজমাট হওয়ার কথা বটে কিন্তু আমার পাড়ার পুজো সেরকম নাম করা বা বড়ো নয়। যেইটুকু ভীড় আসা করা যায় তা আমরা সপ্তমী আর অষ্টমীর দিনই দেখে নিয়েছিলাম। সেই দিনের পুজোর পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছিলো ঘন্টা দুয়েক আগে। মন্ডপে তখন বসে কেবল পাড়ার কয়েকজন যুবক যুবতী আর পুজো কমিটির সদস্যরা। শত হলেও নবমীর রাত - গত তিন দিনের প্রবল ফূর্তির পরিনাম ক্লান্তি রূপে লোকেদের মুখে দৃশ্যমান। ক্লান্তি এবং মা দুর্গার ফিরে যাওয়ার কষ্ট - এই দুটো কারণেই প্রত্যেক বছরের নবমীর দিনে মানুষের কোলাহল কম; পুজোর এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হলেও উত্তেজনা কম কারণ পরের দিনই বিজয়া দশমী। আবার সেই এক বছরের অপেক্ষা শুরু।

পুজোর বাকি দিনগুলোর থেকে তুলনামূলকভাবে শান্ত নবমীর রাতে আমি বাড়ি ফিরছিলাম দশটায়। মা খাবার কিনে আনতে বলেছিলো। সাধারণ দিনে এত রাতে কোনো কাজ করতে বললে আমি হয়ত বিরক্তিই বোধ করতাম। কিন্তু পুজোর সময় আমেজটাই আলাদা। টুনি বাল্ব দিয়ে সাজানো পাড়া, সুন্দর হলদে আর গোলাপি রঙে আলোকিত গোটা রাস্তা। আবার আসেপাশের পূজো মন্ডপগুলোর থেকে ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে ঢাকের ধ্বনি ও হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত গান 'এ সাম মস্তানী, মাদহস কিয়ে যাএ'। গান, ঢাকের আওয়াজ, সবটাই মিলেমিশে একাকার হয়েছে বটে কিন্তু ওই যে... পুজোর দিনের প্রিয় আমেজ!

এই আমেজ উপভোগ করতে করতে হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন মৃদুস্বরে কিছু বলে উঠলো। ঘুরে তাকাতেই কেমন এক অচেনা অনুভূতি আমায় ভর করলো। আপনাদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ভয়,

শান্তি, ও উল্লাস আমি সবটাই অনুভব করলাম এক মুহূর্তের মধ্যে। এই অচেনা অনুভূতির রেশ কাটতে না কাটতেই হঠাৎ মাথায় এলো যে আমার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটিকে আমি চিনি বা আগে কোথাও দেখেছি। কেন জানি না কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন 'আপনি কিছু বললেন?' আমার মুখ থেকে বেরেচ্ছিলো না।

কিছু বলার আগেই সেই ব্যক্তি তাঁর প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

'কোথায় চা পাওয়া যাবে?'

লক্ষ্য করলাম যে তাঁর গলার আওয়াজ মৃদু নয়; খানিকটা কর্কশ, একটু ভারী কিন্তু অধিকাংশ নারীজাতির কথা বলার ধরণে যে মাধুর্য্য থাকে, সেটি তার কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ।

- 'চা? এতো রাতে হয়ত কোনো দোকান খোলা পাবেন না—' বাক্যটি আমি শেষ করতে পারলাম না। অচেনা মানুষটিকে না বলতে আমার বাধলো।

'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখছি।' এই বলে আমি ছুটে গেলাম আমাদের পাড়ার কমিউনিটি হলের পাশের চায়ের দোকানটিতে। সেই চায়ের খুপরির মালিক এক বিহারী লোক যাকে 'পন্ডিতজী' বলেই পাড়ার সবাই চেনে। পন্ডিতজী তার দোকান বন্ধ করে দেয় সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে, কিন্তু পুজোর স্পেশাল দিনগুলোয় সে বারোটা অবধি দোকান খোলা রাখে।

- 'পন্ডিতজী আপনার ইন্টারন্যাশনাল বিজ্‌নেস কি খোলা আছে এখনো?'

ভাঙা বাংলায় সে হাসতে হাসতে বলে উঠলো, 'হাঁ একদম, বড়া প্রফিট করছি আমি।'

- 'এক কাপ চা দিও।'

- 'চা! চা তো বেটি ওর নেহি।'

- 'একটু বসাও না। ওনার দরকার।'

পন্ডিতজী তার খুপরির মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন আমি কার জন্য চায়ের আবেদন করছিলাম।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমার অপরিচিত সঙ্গী। পন্ডিতজীর তাকানো মাত্রই তিনি মিষ্টি হাসি নিয়ে ঘুরে তাকালেন। এখন ভাবলে মনে পড়ে পন্ডিতজীও হয়ত আমার মতোই চমকে উঠেছিল। নিমেষের মধ্যে পন্ডিতজী তার চায়ের কেটলি ছোটো স্টোভ্‌টির ওপর বসিয়ে জল ও দুধ ফোটানো শুরু করে- কোনো কথাই সে আর বাকি সময়টুকু বলে নি।

- 'আপনি... আপনি এখানে চা পাবেন, বসুন।'

-'তুইও এক কাপ চা খেয়ে যা,' তিনি বললেন।

এই আদেশ সমান আমন্ত্রণ আমি ঠিক অমান্য করতে পারলাম না। দুজনেই তারপর কাঠের বেঞ্চের ওপর বসলাম। হয়তো অভদ্র মনে হতো আমায় তখন, কিন্তু কিছুটা নিরূপায়ভাবেই আমি সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েছিলাম... কোথায় দেখেছি তাঁকে? এত চেনা কি করে?

পরনে তাঁর একটি লাল বেনারসী, শাড়ির গায়ে ছোটো বুটি বুটি কাজ, কপালে লাল টিপ, গয়না বলতে হাতে দুটো সোনার বালা, আর মাথায় বড়ো হাতখোপা। শাড়িটাও খুব চেনা লাগছিল।

- 'শাড়ীটা আমায় আমার মেয়ে দিয়েছে,' হঠাৎ তিনি পাশে ঘুরে তাকিয়ে বললেন। শাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে ধরা পড়ায় আমি একটু লজ্জা বোধ করলাম।

- 'পন্ডিত আরো পাঁচটা কাপ চা বানাস,' তিনি আবার ব'লে উঠলেন।

আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কি দল বেধে আমাদের মন্ডপ দেখতে এসেছেন?'

- 'হাহা.... তা বলতে পারিস।'

ততক্ষণে চা বানিয়ে ফেলেছিল পন্ডিত। যেই থালাটিতে পন্ডিতজী সবকটা চা এর ভাঁড় সাজিয়েছিল, সেইটা আমাকে ধরিয়ে ব্যক্তিটি তখন বলে উঠলেন,

'আচ্ছা জয়া, এই দুটো চা এখানে থাক, বাকি পাঁচটা তুই মন্ডপের ভেতর দিয়ে আয়'।

- 'আচ্ছা।'

- 'বাহনদের জন্য নয় কিন্তু।'

- 'আচ্ছা.... হ্যাঁ??'

- 'ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি যা।'

আমি নির্বাক হয়ে তাঁর আদেশ গ্রাহ্য করলাম, কিন্তু তাঁকে তো আমি আমার নাম বলিনি। তিনি জানলেন কি করে আমার নাম জয়া?

পরিস্থিতিটা বিভ্রান্ত করার মতোই ছিল। মন্ডপে পৌছে আমি চায়ের ভাঁড়গুলো নির্দ্ধিধায় রেখে দিলাম পাঁচ মূর্তির সামনে। কেনোই বা সেটা করলাম আমি ঠিক জানি না।

ভাঁড়গুলো রেখে মাথা ওঠাতেই দেখলাম মাঝখানের স্থানটি খালি! অবাক, হতভম্ব... কোন শব্দ ব্যবহার করলে আমার বিস্ময়টা ঠিক ভাবে বোঝানো যায়, আমি জানি না। অতো বড়ো দুর্গার মূর্তি গেলো কোথায়?! মন্ডপে বসে থাকা লোকেরা কি কেউ লক্ষ্য করে নি? এ কি করে হয়?! পাঁচ কাপ চা তাহলে কার জন্য? চারজন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মহিষাসুর কেও?

অসংখ্য প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। আর বেশি না ভাবতে পেরে আমি থালাটা নিয়ে ছুটে বেড়িয়ে পড়লাম পন্ডিতের দোকানের দিকে। সেই সুন্দরী, অহংকারী মহিলা বসেছিলেন বেঞ্চিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে বলুন তো?'

'আমি, তুই।' তিনি হেসে উত্তর দিলেন।

- 'মানে?'

- 'আমার নামও জয়া।'

আমার কিছু বলার আগেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মহিষাসুরকে দিয়েছিস তো এক কাপ চা? কেনো যে ওকে সবুজ রঙ করে? একেই কুৎসিত, তার ওপর সবুজ! কিন্তু পুজোর কয়েকদিন ভালোই পারফরম্যান্স দেয় ও।

' আমি তখন কিছু বলার অবস্থায় নেই। উনি কি নিয়ে কথা বলছিলেন! ব্যক্তিগতভাবে চেনেন উনি মহিষাসুরকে? উনি কি কোনো ধর্মানুষ্ঠানের সদস্য যারা অতি ভক্তিতে পাগল হয়ে যায়? না আমি পাগল হয়ে গিয়েছি?'

- 'তুই কেনো পাগল হবি? এত কম বয়স তাও আবার। যাই হোক... আমি ফিরি আমার জায়গায়! এতদিন টানা একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কোমর ধরে গিয়েছে।'

এতকিছু তিনি বললেন, কিন্তু আমি নির্বাক হয়ে হতভম্ব হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

- 'জয়া তুই আমার হয়ে চায়ের টাকাটা দিয়ে দিবি?'

একটা আবেশের বশে আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, দিয়ে দেবো।'

'আমার সবচেয়ে প্রিয় নাম কিন্তু দুর্গা।'

তিনি হঠাৎ এক গাল হেসে আমার মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, 'আসি তাহলে।'

যেভাবে তিনি এসেছিলেন, সেভাবেই নিঃশব্দে চলে গেলেন। পন্ডিতজী আর আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নিজেকে বাস্তবে ফেরাতে, বিস্মিত পরিস্থিতি থেকে বের করতে আমি সময়টা আবার দেখলাম। অবাক হয়ে দেখি যে ঘড়িতে শুধু ১০ঃ ০২ বাজে। ব্যক্তিটি কি ভূত ছিলেন না স্বয়ং মা দুর্গা? তিনি কি সত্যিই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর নেমে আসেন? কত প্রশ্ন কিন্তু কোনো দৃঢ় উত্তর নেই। মন্ডপে গিয়ে দেখলে কি এখন মাঝখানের স্থানটা ভরা পাবো? নাকি খালিই থাকবে? নিশ্চিত করতে মন্ডপে আবার ঢুকে দেখি যে মা দুর্গা নিজের স্থানে, কিন্তু ফাঁকা পড়ে আছে পাঁচটা চায়ের ভাঁড়।

২০২২ থেকে আমার পূজোর অনুভূতি, ধার্মিক মতামত, বিশ্বাস সবটাই জনসাধারণের থেকে আলাদা। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি নিজে খুঁজে বার করেছি। আবার অনেক নতুন প্রশ্ন আমার মাথায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক বছরই আমাকে 'দুর্গা অ্যান্ড কো' কে ট্রীট্ দিতে হবে? সেইরকম হলে, মায়ের এই বছরের আবদারটা আমি আপনাদের পরের বছর জানাবো।।

গল্প

সল্প

সিগারেটে গাঁজার ছোঁয়া

সঞ্জীব কুমার রাহা, এফ ই ৪৭৪/৫

অরুণের সিগারেটের নেশা যেনো এখনকার মশার রক্ত চোষার মতো। একের পর এক, কিছুতেই ও থামে না। এ যেনো রাবনের জ্বলন্ত চিতা মানব মুখে।

ওর স্ত্রী রোজ রোজ ওকে বলে- তুমি সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর। না হলে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না।
কিন্তু কে শোনে কার কথা?

অরুণ, অরুণের মতো; কিন্তু ওর স্ত্রী অনিমা খুব হতাশ হয়ে একদিন রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল।

তাতেও অরুণের কোন হেলদোল নেই। ও যেমন সিগারেট খেত এখনো তেমনি খেয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। পাড়ার লোক হসপিটালে ভর্তি করে অনিমাকে খবর দিল। অনিমা ছুটে এলো। এসেই ওকে বলল এবার সুস্থ হয়ে বাড়ি এসো, আর এসে আস্তে আস্তে সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর, তা না হলে তুমি বাঁচতে পারবে না। ডাক্তার আমাকে বলেছেন। যাই হোক এ যাত্রায় অরুণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। যাওয়ার সময় ডাক্তার ওকে বলে দিল- আপনি সম্পূর্ণরূপে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিন। তা না হলে ভবিষ্যতে আপনার নিউমোনিয়া হলে আর বাঁচানো যাবে না, ও একটু মুচকি মুচকি হাসলো। হেসে হেসে বললো- ডাক্তারবাবু জীবনের তিন ভাগ তো কাটিয়ে দিলাম। আর মাত্র এক ভাগ সেটা যদি একটু তাড়াতাড়ি হয়, তাতে এই পৃথিবীর কোন ক্ষতি কিংবা উপকার অথবা কোন পরিবর্তন হবে কি? জানি কিছুই হবে না তাই আমি আর ওসব নিয়ে ভাবি না। যা হবার তা তো হবেই। সিগারেট খেলেই যদি মানুষ মরে যেত তবে যে ছেলেটি গতকাল জন্মেছে সে কেন আজ হঠাৎ মারা গেল? তার মাও তো সিগারেট খেত না ! যাইহোক ডাক্তার বাবু বুঝলেন যে এ জ্ঞানপাপী। একে বোছানো আমার সাধ্য নয়। তবুও উনি বললেন পরিবারের কথা ভেবে একটু কমান। দিনে দুটো খেতে পারেন। ও মুচকি হেসে আচ্ছা নমস্কার বলে চলে এলো। দু' চার দিন বাদে ও আবার যেই কে সেই। মুখে সেই রাবনের চিতা!

কে ওকে থামায়? ও এবার বাজার থেকে সিগারেট এবং গাঁজা কিনে এনে বাড়িতে সিগারেটের মধ্যে ভরে খেতে শুরু করল। তাতে সিগারেটের সংখ্যা কমল, কারণ গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে শুয়ে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা। তাই সিগারেট কম খাওয়া হতো। অনিতা ভাবতো ও হয়তো সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একদিন অনিমা আবিষ্কার করে অরুণের ঘরে গাঁজার কল্কি।

অনিতার কাছে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে ও অরুণকে বলে তুমি যখন মরতেই চাইছো তা মর। আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তুমি সিগারেট খাও গাঁজা ছেড়ে দাও প্লিজ।

অরুণ যেন এবার একটু ভাবুক হয়ে গেলো। অনিতার কথার মধ্যে যেন একটা অন্য ভালোবাসা মিশ্রিত আকুতি ভেসে এলো। ও ঠিক করলো আর সিগারেট খাবে না।

যেমন বলা তেমন কাজ। পরদিন থেকে ও আর সিগারেট খেলোই না।

অরুণ যেন এক নতুন আলোর পথের পথিক। সিগারেটের শেষ ধোঁয়ায় উপরে উঠছে আর ওর চোখের সামনে উপর থেকে যেনো সুখের বারিধারা নামছে।